গল্পময় ভারত

প্রথম খণ্ড

সুশীল জানা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯
অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

স্মৃতি, বাচ্চু ও ক্রান্তিকে

প্রথম সংস্করণ

মার্চ ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

জুলাই ১৯৬৩

প্রচ্ছদশিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াত খান লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এ গল্প সংকলনের শুরু সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদে এবং শেষ হয়েছে বৃটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার আগে—বাঙলার নিজস্ব কাহিনীর রাজ্যে। এই সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য প্রায় সবটাই ছন্দে পাঁচালীতে রচিত—কিছু বা নাটকে, কিছু বা সংস্কৃত গদ্যে। সব বৈচিত্র্য নিয়ে এই বিরাট কালের সৃষ্টি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বিস্ময়কর। সে বিস্ময়ের সবটুকু এখানে তু'লে ধরা সম্ভব হয়নি, স্বীকার করি।

পরম লজ্জার সঙ্গে এ-ও স্বীকার করে নিতে হয় যে, জাতির এত বড় একটা বিস্ময়কর ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার কোনও আয়োজন নেই। অথচ প্রত্যেকটি সভ্যজাতিই তার প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তিগুলিকে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু বলে মনে করে এবং তাই সেগুলিকে বহুমূল্য উত্তরাধিকার হিসাবে এক যুগ আর এক যুগের হাতে তুলে দিয়ে যায়। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা এই ভাবেই কাল থেকে কালে প্রবাহিত হয়ে চলে, এই ভাবেই একটি জাতির উন্নত চিন্তার ধারা ও সৃষ্টির নৈপুণ্য নিরবছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়ে চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই মহামান্য রাজ্যটি রক্ষা করে রাখবার জন্য সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই দেখা যায় তাই নানা আয়োজন—নানা বয়সের উপযোগী করে তারা ওই চিরায়ত বস্তুগুলিকে পরিবেশন করে, আস্বাদন করে। দুঃখের বিষয়, সেদিক দিয়ে আমরা দরিদ্র, আত্মবিস্মৃত।

অথচ এই দারিদ্র্য ও আত্মবিস্মৃতির পেছনে আমাদের ঐশ্বর্যপূর্ণ কত বড় একটা রাজ্য পড়ে আছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের গল্প-কথার রাজ্য! দু'খানি মহাকাব্যতেই শুধু এই সৃষ্টি-ধারার উৎপত্তি নয়—তারও অনেক আগে, সুদূর কালের ঋগ্বেদে এই কল্পনা ও নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকালের জীবনবিশ্বাস অনু-যায়ী সেগুলি রচিত, নাটকীয় কথোপকথনে সমৃদ্ধ বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদর্শের সংঘাতও লক্ষণীয়; অবশ্য সে গল্প প্রকৃতি মানুষের আদিম উপাদানে রচিত। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম উপাদান সভ্য ও চিন্তাশীল মানুষের উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিম জীবনবিশ্বাসের পশু-পাখি-আগুন, অসুর-রাক্ষস, প্রাণ ও আত্মার উপকথা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে মানুষের কথায়। বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগের গল্প-কথা পর্যন্ত লক্ষ্য করলেই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরও একটি লক্ষণীয়—বৌদ্ধ যুগের রূপকথা 'পদচিহ্নকুশলী'—যেটিকে মনে হয় আমাদের প্রচলিত রূপকথার আদিমতম রূপ—প্রথম রূপকথা। সেখানে কোনও আর্যামী না রেখেই মানুষেতর যক্ষিনীর মাতৃহৃদয়ের প্রতিও ফুটে উঠেছে কি গভীর মমতা!

এই গল্পের রাজ্য যে শুধু সেকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবলম্বন তপোবন আর রাজসভাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—তা নয়, সাধারণ গ্রামবৃদ্ধদের মজলিশ থেকে কোশল-কাঞ্চীর অন্দরমহল পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। সেই ধারায় সেই কোন্ কাল থেকে বয়ে এসেছে কথা-উপকথার 'মানুষ' নায়ক—রাজা

আর্থারের মত অসাধারণ মানুষ উদয়ন, সাধারণ মানুষ চারুদত্ত। তাদের নিয়ে রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের চিরায়ত সাহিত্য—শ্রেষ্ঠ নাটক।

শুধু স্বদেশেই নয়, জগতের বহু দেশে ভারতবর্ষ তার গল্প-কথার রত্নগুলিকে অকৃপণ হাতে বিলিয়ে এসেছে। গান্ধারের কোন্ সরাইখানা থেকে অথবা মণি-মুক্তার কোন বাণিজ্যতরণী থেকে কে কবে এগুলিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে—তবে ম্যাকসমূলার সাহেব প্রাচীন বৈদিক কথার অনেক ইওরোপীয় সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, আমাদের 'করটক ও দমনক'-কথা সিরিয়া ও আরবে যথাক্রমে 'কলিলগ ও দমনগ' এবং 'কলিলা ও দিমনা' রূপে বেশ বদলেছিল, আমাদের জাতকমালার আরও বহু গল্প ঈশপের হাতে নূতন করে পরিবেশিত হয়েছিল।

এই প্রাচীন রাজ্যের পরিক্রমণ শেষ করেছি বাংলায় এসে—ভারতে ইংরাজ প্রভুত্বের প্রথম প্রদেশে। তবে আমাদের সংকলনের কাহিনী শেষ হচ্ছে ইংরাজ প্রভাবের পূর্বকালে—যখন আমাদের পল্লী-কবি ও কথকের কণ্ঠে গোপীচন্দ্র ও কাজলরেখার করুণ কাহিনী তরঙ্গিত হচ্ছে, গ্রামের মেয়ে ও বধূর কণ্ঠে উঠছে সূর্যের পাঁচালী গান। সময়ের হিসেবে এর পরে পাশ্চাত্য প্রভাবে রচিত হয়েছে আমাদের নূতন ধারার সাহিত্য। এর আগে প্রাচীন যুগ যেন কাজলরেখার মতই তার শান্ত গ্রাম্যতা, নির্বোধ সহিষ্ণুতাও নিঃশব্দ আবেদন নিয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেছে। সূয্যিঠাকুরের গ্রাম্য বধূটির কান্নার মতই ধীরে ধীরে তা গ্রামের অন্ধকারে চিরকালের মত কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। তবু, সবটি মিলে আনন্দ-বেদনায় বিচিত্র আমাদের এ সাহিত্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে সেই ক্রমপরিণত ও বিস্মৃত গল্পরাজ্যটিকে তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'গল্পময় ভারত'-এর প্রথম সংস্করণ বেশ কিছুকাল আগেই নিঃশেষিত হয়েছে। বর্তমান কাগজ-সংকট ও আরও নানারকম অসুবিধের জন্যে এর আগ্রহী পাঠকদের সামনে দ্বিতীয় সংস্করণের বই ঠিক সময়ে উপস্থিত করা যায়নি। যাই হোক, বর্তমানে নব সজ্জায় একে উপস্থিত করা হলো। যাদের জন্যে এই বই লেখা, তাদের কাছে এ বইয়ে জনপ্রিয়তা লেখকের আনন্দের কারণ অবশ্যই।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটিকে দুই খণ্ডে আলাদা করা হলো। বর্তমান উচ্চ মূল্যমানের বাজারে একখণ্ডে সম্পূর্ণ করে পুরাতন দাম আর রাখা সম্ভব হতো না। তাই দাম কমিয়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হলো। এই খণ্ড-বিভাগের ফলে পরিবেশিত গল্পগুলির ধারাবাহিকতা কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি।

লেখক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

সত্যপালন

ঋগ্বেদ ঃ ১০ম মণ্ডল থেকে

একদা দেবরাজ্যে মহা হট্টগোল। দেবতাদের যত গোরু ছিল সব কারা যেন চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে। সেই দুঃখে দেবতারা সব 'হায় হায়' করছেন। ভোগের মধ্যে সেরা যে ভোগ দুধ, ঘি, ছানা, মাখন—এবার সব বুঝি বন্ধ হয়!

দুঃখে দেবতারা মুষড়ে পড়লেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। তাঁকে খুশী রাখবার জন্য অপ্সরারা নাচগান শুরু করতে যাচ্ছিল—ইন্দ্র তাদের বকে দিলেন। একে বকলেন—ওকে ধমকালেন। রাগ করে ইন্দ্রাণী গোসা-ঘরে ঢুকলেন। বসন্ত ভয়ে চির-শীতের রাজ্য হিমালয়ে গিয়ে লুকাল। কোকিল আর ডাকল না। নন্দনকাননের পারিজাত আর ফুটল না। স্বর্গরাজ্য ম্লান।

হা-হুতাশ করতে করতে দেবতারা গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। দেবরাজ সমস্ত দেবতাদের নিয়ে সভা করে বসলেন। জোর আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত সব দেবতা মিলে ঠিক করলেন—গোরু-চোরের সঙ্গে লড়াই করা হোক।

লড়াই তো হবে কিন্তু সে চোর কোথায়? সে চোরই বা কে? এটাই যে এক মহা মুশকিলের কথা। দেবতারা ফাঁপরে পড়লেন।

দেবসভার এককোণে কুকুর-জননী সরমা কুণ্ডলী পাকিয়ে দেবতাদের সমালোচনা ও হুঙ্কার শুনছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে ডেকে বললেন, 'সরম, চোর খুঁজে বার কর। এ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।'

দেবরাজের কথায় সরমা উঠে বসল। কিন্তু তার মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। মনে তার দুঃখ। দেবলোকের কুকুর হলে কি হবে, তার ভোগের মধ্যে দেবতাদের দুধ, ঘি, ছানা, মাখনের ছিটেফোঁটাও নেই। সময় ও সুযোগ পেয়ে সে মনের দুঃখের কথাটা বলে ফেলল,

'দেবরাজ ইন্দ্র, যেমন করে হোক গোরুর সন্ধান আমি এনে দেবই। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের একটু করে দুধ খেতে দেবে বল।'

ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু। তাই হবে! তুমি চোর আর গোরু খুঁজে বের কর।'

শিকারী কুকুরের মত সরমা ছুটল গোরুর সন্ধানে। অনেক পাহাড় নদী জঙ্গল পার হয়ে সরমা ছুটল। নদী তাকে ভয়ে পথ ছেড়ে দিল, পাহাড় জঙ্গল তার পথ করে দিল। অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে সরমা ক্লান্ত। তবু তার বিরাম নেই। দেবতাদের কাছে কথা রাখতে হবে। তা ছাড়া, এতদিন পরে তার সন্তানদের কপালে একটু দুধ খাবার সুযোগ এসেছে—তা নষ্ট করলে চলবে না। সরমা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে গোরু খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় দেবতাদের গোরু?

হঠাৎ একদিন সে পাহাড়-ঘেরা এক দেশের সীমান্তে এসে গোরুর
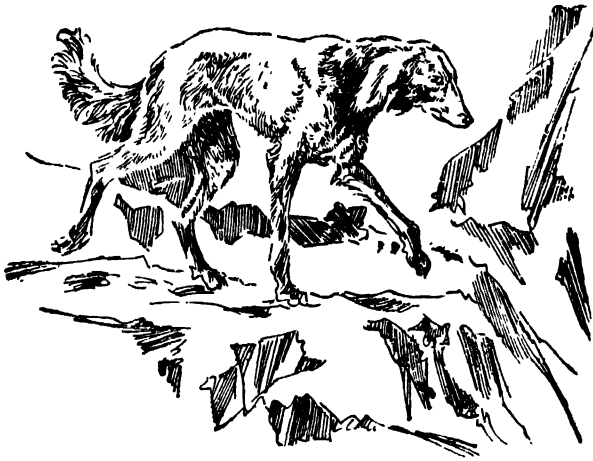
ডাক শুনতে পেল। একটি ছুটি গোরু নয়—একপাল গোরু-বাছুরের ডাক। সরমা থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে শুনল—পাহাড়ের দিকেই যেন গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। গেল সে পাহাড়ের দিকে। কিন্তু কোথায় গোরু? পাহাড় জঙ্গল সে পাতি পাতি করে খুঁজল, গোরুর দেখা পেল না। অথচ পাহাড়ের দিকেই বাতাসে যে গোরুর ডাক কাঁপছে! সরমা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যেমন করেই হোক এ রহস্য ভেদ করতে হবে।

পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে সরমা চলল লোকালয়ের দিকে।

সে রাজ্য হল পণি নামক অসুরদের। তারা বণিক—ধনবান। সরমাকে আসতে দেখে তারা অবাক হয়ে দাঁড়াল। এমন সুন্দর কুকুর তারা কখনও দেখেনি। যতই হোক, কুকুর-জননী সরমা দেবলোকের কুকুর! তার রূপে পথ আলো। সবাই তাকে আদর করে ডাকল, যত্ন করে খেতে দিল। সরমা পেল নূতন আশ্রয়, ভালো ভালো খাবার আর সকলের আদর যত্ন। পণিদের সঙ্গে সরমা দিব্যি বন্ধুত্ব করে নিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের মাঠ-ঘাট, ঘর-দুয়ার সব জেনে ফেলল। কিন্তু গোরু কোথায় সেটাই সে কোনরকমে জানতে পারল না। অথচ গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যায় পাহাড়ে জঙ্গলে আকাশে বাতাসে।

পণিদের ক্ষেতখামার, ধনসম্পদ পাহারা দিতে দিতে একদিন সে

গোরুগুলোর সন্ধান পেয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখল পণিরা দেবতাদের গোরুগুলোকে পাহাড়ের গভীর গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছে।

এতদিনের এত সন্ধান, এত কষ্টের শেষ হল। সরমাকে তখন আর পায় কে! পণিদের দেশ ছেড়ে একদিন সে ধরল আবার দেবলোকের পথ।

পণিরা অবাক হয়ে শুধাল, 'সরমা কোথায় যাও?'

সরমা বলল, 'দেবরাজ ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি এসেছিলাম। দেবতাদের অনেক গোধন তোমরা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছ। ইন্দ্রের হাতে এবার তোমরা মারা পড়বে। দাঁড়াও একবার দেবলোকে ফিরে যাই।'

পণিরা বলল, 'সে যে অনেক—অনেক দূরের পথ! এ পথে আসতে হলে, একবার পেছন ফিরে তাকালে আর আসা যায় না। তা ছাড়া, পথের মাঝখানে আছে কত বড় বড় নদী!'

সরমা বলল, 'নদীর জল আমাকে ভয় পায়?'

পণিরা তখন সরমার রূপ গুণের সুখ্যাতি করে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করল, 'শোন শোন সুন্দরী সরমা, আমাদের কাছে ফিরে এস। দেবলোক থেকে যখন এতটা পথ এসেছ তুমি—যে কটা গোরু চাও নাও। ভেবে দেখ একবার, বিনা যুদ্ধে এ সব গোরু কেউ কাউকে দেয় না।'

এ প্রলোভনে সরমা ভুলল না। বললে, 'ইন্দ্র তোমাদের পাপের শাস্তি দেবেন। তাঁর শক্তি তো জান না!'

পণিরাও তখন ভয় আর হুমকি দেখিয়ে বলল, 'আমাদের গোরু-ঘোড়া ধন-সম্পদ আর এই দেশ—সব বড় বড় পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আমাদের মহাবীর যোদ্ধারা সে সব রক্ষা করছে। তা ছাড়া আমাদের কত রকমের ধারালো সব অস্ত্র শস্ত্র আছে জান?'

সরমা বলল, 'ভালোয় ভালোয় গোরুগুলি ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের দর্প চূর্ণ হবে।' এই বলে সরমা দেবলোকের দিকে চলতে লাগল।

বিপদ বুঝে পণিরা নানাভাবে সরমার মন ভাঙাবার চেষ্টা করল। নানা রকমের লোভ দেখাল। বলতে লাগল, 'শোন শোন সুন্দরী সরমা, বুঝতে পারছি—দেবতারা তোমাকে ভয় দেখিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি ফিরে এস—তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে আমরা

বোনের মত রক্ষা করব। আদর করব, যত্ন করব। গোরুও দেব অনেক।'

এই গোরুর দুধ একটুর জন্য সরমার মনে বড় দুঃখ ছিল। তার সন্তান সন্ততিরা দুধ পায় না। এই দুধের জন্য ইন্দ্রের কাছে তাকে প্রার্থনা করতে হয়েছে। আর এখন পণিরা সেই সব গোরুর ভাগ দেবে বলে তাকে সাধাসাধি করছে! এ দেশে থেকে গেলে সরমার কত সুখভোগ, কত আদর আর কত যত্ন!

সরমা পণিদের দিকে একবার মুখ তুলে চাইল। হয়তো সে ফিরে আসবে—এই আশায় পণিরা বার বার আদর করে ডাকতে লাগল, 'ফিরে এস সরমা সুন্দরী ফিরে এস।'

সরমা কিন্তু আর দাঁড়াল না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দেবলোকের দিকে চলতে লাগল। না—এখানে যত সুখই থাক, দেবলোক যে তার স্বদেশ! কেমন করে স্বদেশকে সে ভুলে থাকবে? কেমন করে সে বিশ্বাসঘাতিনী হবে?

দেবলোকের কুকুর-জননী—দেবলোকে আবার ফিরে চলল।

দেবরাজ্য তোলপাড়। শেষ পর্যন্ত সরমা শত্রুদের সন্ধান নিয়ে ফিরেছে। দেবতারা 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজ্যে উঠল 'সাজ সাজ' রব। দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য সাজসজ্জা করলেন। ইন্দ্রের আগে আগে ছুটল মহাঝড়ের দেবতা মরুৎ। স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে উঠল ভীষণ ঝড়। ঘন ঘন বজ্রাঘাতে পণিদের সেই পাহাড়-ঘেরা দেশে হাহাকার পড়ে গেল। গুহার গভীর অন্ধকারে বন্দী গোরুগুলিকে উদ্ধার করে দেবরাজ ইন্দ্র একদিন আবার দেবলোকে ফিরে এলেন।

....

অগ্নির পলায়ন

ঋগ্বেদ : ১০ম মণ্ডল থেকে

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। আদিম মানুষ ভয় পেয়ে তাকাল আকাশের দিকে। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার, আর তার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর বজ্রের আগুন। ভয় পেয়ে তারা বনের আশ্রয়ে পালাল। কিন্তু বনেও কি নিস্তার আছে? একদিন বনে দেখল দাবানল। দুটো বড় বড় গাছের ডালে ঘষা লাগতে লাগতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। পশুপাখি গাছপালা পুড়ে পুড়ে সব ছাই হতে লাগল। ভয় পেয়ে তারা পালাল সমুদ্রের ধারে। কিন্তু সেখানেও কি নিস্তার আছে? একদিন সাগরের জলে দেখল বাড়বানল। ভয় পেয়ে পালাল তারা পাহাড়ের গুহায়। হায়, সেখানেও নিস্তার নেই। একদিন পাহাড়ের বুক চিরে পাতালপুরী থেকে উঠল আগুনের হলকা ধোঁয়া আর লাভাস্রোত। অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র,—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—সর্বত্র জুড়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর আগুন। তখন সবাই আকাশের দিকে হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'হে অগ্নিদেবতা, আমাদের রক্ষা কর—রক্ষা কর।'

সেদিন থেকে অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জুড়ে অগ্নি হলেন ত্রিভুবনের দেবতা। প্রচণ্ড তাঁর তেজ।

সেই প্রচণ্ড দেবতা একদিন যেন দয়া করেই মানুষের কাছে ধরা দিলেন। আদিম মানুষ পাথরে পাথর ঠুকতে ঠুকতে দেখল সেই প্রচণ্ড দেবতার ছোট্ট মূর্তিখানি—সামান্য একটু আগুনের ঝিলিক। সযত্নে সেই আগুনটুকুকে নিয়ে আদিম মানুষেরা কাঠকুটো এনে ধুনি জ্বালাল। আদিম মানুষের গুহার অন্ধকার আলো হয়ে উঠল। সে আগুন দেখে বনের পশুরা ভয় পেয়ে দূরে পালাল। ধুনি জ্বেলে জ্বেলে অগ্নিদেবতার সেই ছোট্ট মূর্তিটুকু মানুষ সেদিন রক্ষা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে শিখল তারা সেই আগুনে মাংস পুড়িয়ে খেতে, শিখল ধাতু গলিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে। অগ্নি দেবতার দয়ার আর অন্ত নেই। দেহ দান

করলেন তিনি মানুষের জন্য। তাঁর সাহায্যে মানুষ একদিন জঙ্গল ছেড়ে গ্রাম গড়ল, জনপদ গড়ল, বড় বড় নগর গড়ে তুলল। গড়ে তুলল আদ্যিকালের সভ্যতা।

কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে বড় বড় ঋষিরা তাঁর বন্দনা গান করলেন। বিরাট বিরাট আগুনের ধুনি জ্বেলে দেবতাকে কলসী কলসী ঘি খাওয়াতে লাগলেন।

অগ্নি ছাড়া আরও দেবতা আছেন—ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, মরুৎ। এঁদের জন্যও মানুষ কলসী কলসী ঘি জড়ো করল। তারা অগ্নিকে অনুরোধ করল, 'হে অগ্নি, আমাদের এই ঘিটুকু যদি অন্য দেবতাদের কাছেও দয়া করে পৌঁছে দাও!'

যেমন মানুষেরা অনুরোধ করল তেমনি দেবতারাও একযোগে এসে

একদিন অগ্নিকে ধরে পড়লেন। বললেন, 'দেখ, ঘি তুমি একাই খাবে—এটা ঠিক নয়। মর্ত্যের মানুষ আমাদের জন্য কলসী কলসী ঘি জমা করে রেখেছে। তুমি মানুষের সবচেয়ে কাছে থাক বলেই তোমাকে অনুরোধ করছি—আমাদের ঘিটুকুও বয়ে এনে দাও।'

অগ্নি দেবতা রাজী হলেন। দেবতারা সব ঘি খাওয়ার আনন্দে খুব কোলাহল করতে করতে চলে গেলেন।

সেদিন থেকে যত লোক যত দেবতার নামে যজ্ঞ করে, তার ঘিটুকু অগ্নি দেবতা সেই সব দেবতার কাছে বয়ে বয়ে দিতে লাগলেন। রোজ কত কলসী ঘি যে তাঁকে ভারে ভারে বইতে হয়, তার ঠিক নেই। শুধু কি ঘি—রুটি, মধু, গোরু, ছাগল, ভেড়া—যত রকমের জিনিস মানুষ যজ্ঞে সমর্পণ করে তা সবই কাঁধে করে স্বর্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর ঘিয়ের তো কথাই নেই। দেবতারা ঘি ভালবাসেন বলে মানুষ ওই বস্তুটাই আবার যজ্ঞে বেশি করে দেয়। কিন্তু এদিকে ঘিয়ের ভার বয়ে বয়ে অগ্নি দেবতার কাঁধে প্রায় কালশিটে পড়ে গেল। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ—এই রকম চলতে লাগল।

তারপর একদিন অগ্নি দেবতা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 'দুত্তোর' বলে মানুষের যজ্ঞ ছেড়ে পালালেন। নিজের তেজ খণ্ড খণ্ড করে লুকিয়ে রাখলেন নানা জায়গায়। কোথাও ধান, কলাই, যবের গাছে, কোথাও বড় বড় গাছে, কোথাও-বা প্রাণীদের শরীরের মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে তেজকে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর স্বয়ং নিজে মোটা একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে জলে ডুব দিলেন।

দেবতারা 'হায় হায়' করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। মর্ত্যের মানুষের ঘি আর স্বর্গে আসে না। দেবতাদের খাওয়ার রুচি চলে গেল। ঘিয়ের দুঃখে তাঁদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল। সবাই গিয়ে ধরে পড়লেন যমকে। যমরাজ চললেন অগ্নি দেবতাকে খুঁজতে।

তিন লোক খুঁজে খুঁজে যম দেখলেন—অগ্নি দেবতা নিজের তেজকে খণ্ড খণ্ড করে এখানে ওখানে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আসল লোকটা গেল কোথায়? ঘুরে ঘুরে পেয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত অগাধ

জলের নীচে—কাঁথা মুড়ি দিয়ে অগ্নি দেবতা গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আগুনের দীপ্তি কি কাঁথায় ঢাকা পড়ে?

সঙ্গে সঙ্গে যম ছুটলেন দেবতাদের কাছে খবর নিয়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা দল বেঁধে ছুটে এলেন। জলের ধারে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন অগ্নিকে অনেক কাকুতি মিনতি করে।

দেবতারা বললেন, 'হে অগ্নি, তুমি কোথায় লুকোবে? একজন দেবতা যে তোমায় দেখে ফেলেছেন।'

অগ্নি দেবতা আরও একটু কুঁকড়ে গা-ঢাকা দিয়ে বসলেন।

দেবতারা বললেন, 'কেন লুকোচ্ছ তুমি! নিজেকে কোথায় ঢেকে রাখবে তুমি! নিজের তেজ তুমি যত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছ—সব জায়গায় যে তোমাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন।'

অগ্নি দেবতা তবু গা-ঢাকা দিয়ে থেকেই বললেন, 'অমনি বললেই হল! কে আমাকে দেখতে পেয়েছে? হেঁ হেঁ—বল দেখি—আমি কোথায় আছি?'

দেবতারা হেসে বললেন 'হেঃ হেঃ—ওই যে তুমি জলের মধ্যে ঘুপটি মেরে বসে আছ! আর তোমার তেজকে লুকিয়ে রেখেছ বড় বড় গাছের মধ্যে, ছোট ছোট ধান, যব, কলাইয়ের গাছের মধ্যে, প্রাণীদের শরীরে। এমনি আরও কত জায়গায়।'

ধরা পড়ে গিয়ে অগ্নি দেবতা হতাশ হয়ে বললেন, 'কে আমাকে দেখেছে?'

দেবতারা বললেন, 'যম। যম তোমাকে দেখেই চিনেছে।'

শুনে অগ্নি দেবতা যমের ওপর খুব চটে গেলেন। তিনি বললেন, 'দোহাই তোমাদের—আমি আর যাব না। তোমাদের ওই ঘি বয়ে বয়ে কি আমাকে মরে যেতে বল? আমার দ্বারা ও আর হবে না।'

ঘিয়ের কথায় দেবতাদের পুরানো শোক উথলে উঠল: আহা কতদিন তাঁরা ঘি খাননি। দেবতারা কাকুতি মিনতি করে ডাকতে লাগলেন, 'এস অগ্নি—এস। দেবভক্ত মানুষেরা কত কষ্ট করে যজ্ঞের আয়োজন করেছে, কত কলসী কলসী ঘি তারা যোগাড় করেছে। তুমি লুকিয়ে থেকে সব ভণ্ডুল করে দিয়ো না। ঘিটুকু যাতে দেবতাদের কাছে এসে পৌছয় তার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

অগ্নি বললেন, 'ওই যজ্ঞের ভার বইবার ভয়েই আমি পালিয়ে এসেছি। তোমরা তো জান, আমার আগের ভায়েরা ওই ঘি বয়ে বয়েই মারা গেছে। তাই আমি আর যেতে চাইনে।'

দেবতারা বললেন, 'মরার ভয় ক'রো না, তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ু বর দিচ্ছি। তুমি মরবে না। তুমি ফিরে এস। দেবতাদের ঘিটুকু বয়ে দাও।' একটু খোশামোদ করে তাঁরা আরও বললেন, 'আহা, তোমার কি কল্যাণময় চেহারা—কি সুন্দর! তুমি সকলের কত উপকার কর—এত বড় উপকারী কেউ আর নেই। দেবতাদের এই উপকারটুকু করে দাও।'

খোশামোদে অগ্নির মন একটু গলে গেল। তিনি বললেন, 'আমি যেতে পারি–যদি তোমাদের ভাগ থেকে তোমরা যজ্ঞের প্রথম ভাগের ঘিটুকু আমাকে দাও। তা ছাড়া শেষ ভাগের ঘিও কিছুটা দিতে হবে।'

দেবতারা বললেন, 'তাই দেব—তুমি ফিরে এস।'

অগ্নি বললেন, 'তা হলে অনন্ত পরমায়ু্ দাও।'

দেবতারা বললেন, 'দিচ্ছি। তুমি জল থেকে উঠে এস। যে দেবতার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ হোক না কেন, আজ থেকে সব যজ্ঞের তুমিই হবে প্রধান। চার দিক তোমার কাছে মাথা নত করবে।'

শেষ পর্যন্ত অগ্নি দেবতা আবার ফিরে এলেন।

....

যজ্ঞের বলি

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে

আদ্যিকালের সে এক রাজা—নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র। রাজার অন্নের অভাব নেই—এটা খান, ওটা খান। বস্ত্রের অভাব নেই—শীতে জলে হি-হি করে কাঁপতে হয় না! সোনা-দানা অঢেল—রাজার মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, কোমরে চন্দ্রহার। এ সব ছাড়াও ঘর-আলো-করা একশ' রানী। রাজার একশ'টা শ্বশুরবাড়ি থেকে কত শত ঘোড়া ছাগল যৌতুক এসেছে গোনা-গুন্তি নেই।

রাজা দিব্যি ছিলেন মনের সুখে। কিন্তু যত গোলমালের গোঁসাই নারদ মুনি এসে এক কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। রাজাকে তিনি বললেন, 'তোমার ওসব কিছু নয়। ভাল মন্দ খেয়ে পরে সোনা-দানায় দিব্যি সেজেগুজে থাকা যায় বটে, আর বিয়ে করলেই অনেক গোরু-ঘোড়া যৌতুকও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সব থাকতেও ঘর তোমার অন্ধকার। কারণ তোমার ছেলেপুলে নেই?'

রাজা বললেন, 'তবে উপায়?'

নারদ বললেন 'তুমি বরুণ দেবতার কাছে মানত কর। বল যে, ছেলে হলে তাঁকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করবে।'

রাজা মানত করলেন।

বরুণ দেবতা খুশী হয়ে বর দিলেন। রাজপুত্রের জন্ম হল। রাজা নাম রাখলেন রোহিত। আনন্দ উৎসবে রাজা আর তাঁর একশ' রানী মেতে উঠলেন।

বরুণ দেবতা একদিন এসে বললেন, 'কই রাজা, যজ্ঞ করে ছেলে বলি দিলে না তো?'

রাজার বুক কেঁপে উঠল। আহা, ওই একরত্তি ছেলে। তার জন্মের পর দশটা দিনও কাটে নি। কিন্তু উপায় নেই—যজ্ঞের বলি

রাজাকে দিতেই হবে। এমনি ছিল নিয়ম। রাজা বললেন, 'দশটা দিন যাক—তখন যজ্ঞ করব।'

শুধু দশ দিন নয়, দশ মাস গেল, দশ বছর গেল। রাজা নানান কথা বলে বরুণ দেবতাকে ফেরাতে লাগলেন। কখনও বললেন, 'দুধে-দাঁত উঠুক।' কখনও বললেন, 'দুধে-দাঁত ভাঙুক।' কখনও-বা বললেন, 'আসল দাঁত উঠুক।'

বরুণ দেবতা বার বার ফিরে গেলেন।

রাজা শেষবার বললেন, 'পশু বলি আর মানুষ বলিতে তফাত আছে তো ঠাকুর। রোহিত আবার ক্ষত্রিয়ের ছেলে। ক্ষত্রিয়ের ছেলে যতদিন না ধনুর্বাণ ধরতে শেখে ততদিন সে বলির যোগ্য হয় না। এই তো শাস্ত্রের নিয়ম।'

বরুণ দেবতা সেবারও ফিরে গেলেন। এদিকে রাজা রোহিতকে ধনুর্বিদ্যা শেখাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন—যাতে সে তাড়াতাড়ি

একটা মস্ত বড় বীর হয়ে উঠতে পারে। হলও তাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রোহিত ধনুর্বিদ্যা শিখল—রোহিত হল মস্ত বীর। তখন নিজেকে রক্ষা করবার মত তার সাহস হল, শক্তিও হল!

এদিকে বরুণ দেবতা আবার একদিন এসে হাজির। রাজার বুক কেঁপে উঠল। রোহিতকে ডেকে রাজা বললেন, 'বাছা বরুণের দয়াতেই তোকে পেয়েছিলাম। কথা ছিল—তোকে যজ্ঞে বলি দেব।'

রোহিত বীরদর্পে বলল, 'তা কখনও হতে পারে না।'

এই বলে সে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল। বলির জন্য কেউ তাকে ধরতে সাহস করল না।

কিন্তু জলের দেবতা ছাড়লেন না। রোহিতের হল উদরী রোগ—জলের দেবতা চটে মটে তার পেটের মধ্যে জল চালান করে দিলেন। পেটটা ফুলে হয়ে উঠল জয়ঢাক। শরীর হল দুর্বল। হাত-পা হল কাঠির মত। রোগে ভুগে ভুগে বছরখানেক পরে রোহিত তখন বন ছেড়ে ঘরে ফেরবার পথ ধরল। মনে বিশ্রামের আশা।

রোহিতকে ঘরে ফিরতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের কি জানি কি মনে হল—ছুটলেন তিনি ব্রাহ্মণের বেশে। হয়তো ভাবলেন—ঘরে বিশ্রাম নিতে গেলে রোহিত আর বাঁচবে না। তাই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রোহিতের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওহে রোহিত চলে বেড়াও—তাতে তোমার অনেক লাভ। বসে থাকলে সেরা মানুষেরাও অনেক কষ্ট পায়। যে চলে বেড়ায়—ইন্দ্র তার সখা। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

পূজনীয় এক ব্রাহ্মণ তাকে চলে বেড়াতে বললেন—এই ভেবে রোহিত গোটা একটা বছর বনে বনে ঘুরে বেড়াল। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যেমনি আবার একদিন ঘরে ফিরতে যাবে অমনি ইন্দ্র আবার সেই ব্রাহ্মণের বেশে সামনে এসে হাজির। রোহিতের কাঠির মত পা দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, 'যে লোক ঘুরে বেড়ায় তার হাত পা হয় ফুলধরা গাছের মত সুন্দর, দেহ যেন হয় ফল-ধরা গাছ। চলে বেড়ানোর যে পরিশ্রম—তার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই রোহিত। তাতে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

এমনি ভাবে রোহিত যতবার দেশে ফিতে আসতে চাইল ততবারই ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে এসে রোহিতকে বাধা দিলেন। চলে বেড়ালে যে তার লাভ হবে—এই কথাটা বারবার নানা ভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বললেন, 'যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, সে হল ঘোর কলির লোক। যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে—সে দ্বাপর যুগের লোক। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়—সে হল ত্রেতাযুগের লোক। আর যে চলে বেড়ায়—তার ভাগ্যে নানা দিকে লাভ, সে সত্য-যুগের লোক। দেখ সূর্যের মাহাত্ম্য, তিনি চলছেন —চলছেন—চলছেন। তাই বার বার করে বলি তুমিও চলে বেড়াও রোহিত—চল—চল।'

তাঁর কথা শুনে শুনে রোহিত বার বার ফিরে ফিরে গেল। কিন্তু বরুণের অভিশাপে পেটে জল জমে তেমনি জয়ঢাক হয়ে রইল। এমনি করে কেটে গেল ছ'টি বছর। রোহিত বনে বনে ঘুরে বেড়াল।

শেষ বছরে রোহিত বনের মধ্যে এক ঋষিকে দেখতে পেল। ঋষি বড় গরীব। তাঁর নাম অজীগর্ত। তাঁর আশ্রম-কুটিরের অবস্থা বড়ই খারাপ। গোরু-বাছুর, ঘোড়া-ভেড়া একটিও নেই। না আছে ঘরে এক মুঠো যব ধান। থাকার মধ্যে আছে শুধু স্ত্রী আর তিনটি ছেলে। ছেলেদের নাম হল শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল। তাদের খাওয়াতে পরাতে ঋষি একেবারে নাজেহাল।

রোহিত একটা মতলব এঁটে অজীগর্তের আশ্রমে গিয়ে হাজির হল। অজীগর্তকে ডেকে বলল, 'ঋষি, তোমাকে একশটা গোরু দেব, কিন্তু তোমার একটি ছেলেকে দিতে হবে।'

অজীগর্ত বললেন, 'ছেলে নিয়ে কি করবে?'

রোহিত বলল, 'আমার বদলে তাকে যজ্ঞে বলি দিয়ে বরুণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হব।'

ঋষির বড় অভাব—তাই রাজী হলেন। কিন্তু বড় ছেলেটিকে ঋষি কাছে টেনে নিলেন। যতই হোক—সে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠেছে, বাপকে সাহায্য করতে পারবে। তার হাত ধরে ঋষি বললেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেব না।'

একেবারে ছোট ছেলেটি এখনও অসহায়। তার মা তাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেবো না।'

বাকী রইল মাঝেরটি। সে বেচারী শুনঃশেফ। রাজার ছেলে রোহিত—ধনদৌলতের অভাব নেই। তাই একশ' গোরুর বদলে শুনঃশেফকে যজ্ঞের বলি হিসেবে পেতে কষ্ট হল না। বাপকে এসে বলল, 'বরুণের যজ্ঞে শুনঃশেফকে বলি দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।'

অজীগর্তকে একশ' গাই-গোরু দিয়ে রোহিত শুনঃশেফকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণকে বললেন, 'রোহিতের বদলে আমি এই শুনঃ-শেফকে দিয়ে তোমার যজ্ঞ করব।'

বদল হোক, যাই হোক—যজ্ঞের বলি দিতে হবে—এই ছিল তখন নিয়ম। বরুণ দেবতা খুশী হয়ে বললেন, 'সে তো খুব ভালো! ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের তো বলি হিসেবে আদর আরও বেশী! এবার তবে যজ্ঞ কর।'

হরিশ্চন্দ্র এবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

সে এক বিরাট যজ্ঞ। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি বশিষ্ঠের মত বড় বড় ঋষিরা যজ্ঞ করতে এলেন। স্বয়ং বিশ্বামিত্র হলেন যজ্ঞের হোতা—পুরোহিত। শুনঃশেফ বেচারী একপাশে বলির পশুর মত বসে রইল।

কিন্তু বলির সময়ে লাগল গোলমাল। শুনঃশেফকে হাড়িকাঠে বাঁধবে কে? কেউই রাজী হল না।

তখন গরীব অজীগর্ত বললেন, 'আমাকে যদি আরও একশ' গাই-গোরু দাও, তা হলে আমি বাঁধতে পারি।'

হরিশ্চন্দ্র তাঁকে আরও একশ' গাই-গোরু দিলেন। অজীগর্ত এগিয়ে গিয়ে নিজের ছেলেকে হাড়িকাঠে বাঁধলেন।

কিন্তু বাঁধা তো হল—তারপর কাটবে কে?

কেউই রাজী হল না।

তখন লোভী অজীগর্ত আবার বললেন, 'আমাকে যদি আরও একশ' গাই-গোরু দাও, তাহলে আমি কাটতে পারি।'

হরিশ্চন্দ্র তাঁকে আরও একশ' গাই দিলেন। অজীগর্ত শাণিত

খড়্গ হাতে নিয়ে হাজির হলেন।

বেচারী শুনঃশেফ সকলের মুখের দিকে একবার কাতর চোখে চেয়ে দেখল—কারও মুখে দয়ার চিহ্ন নেই। সবাই ব্যস্ত যজ্ঞ যাতে ভালো ভাবে শেষ হয়। শুনঃশেফ বুঝতে পারল—এঁরা কেউই তাকে বাঁচাতে আসবে না। তাই মনে মনে সে কাতরভাবে ব্রহ্মাকে ডাকতে লাগল। ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি অগ্নি দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ অগ্নির বন্দনা করে তাঁর আশ্রয় চাইল। অগ্নি বললেন, 'তুমি সূর্য দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ তখন সূর্যের বন্দনা গান করে তাঁর আশ্রয় চাইল। কিন্তু সমস্ত দেবতাই ওর নাম করে যেন এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

শুনঃশেফ সকলেরই বন্দনা করে আশ্রয় চাইতে লাগল। স্বয়ং

বরুণ, দুইজন অশ্বিনীকুমার, শেষে দেবরাজ ইন্দ্র—সকলের স্তবস্তুতি শেষ করে শুনঃশেফ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল দেবরাজ ইন্দ্রের। তার বাঁধন আপনি খুলে গেল। ইন্দ্র তাকে সোনার রথ দান করলেন। ওদিকে বরুণও প্রসন্ন হলেন। তাই রোহিতের রোগও সেরে গেল—তার জয়ঢাকের মত পেটটা আস্তে আস্তে কমে গেল।

শুনঃশেফের উপর দেবতার করুণা ও আশীর্বাদ দেখে ঋষিরা খুশী হয়ে বললেন, 'আমাদের এ যজ্ঞ তাহলে তুমিই শেষ করে দাও শুনঃশেফ।'

শুনঃশেফ তখন শাস্ত্রের নিয়ম মত যজ্ঞ শেষ করল। ঋষি বিশ্বামিত্র তার কাজ দেখে খুব বাহবা দিলেন। যজ্ঞ শেষ করে বালক শুনঃশেফ ঋষি বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়ে চেপে বসল। ঋষিও তাকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করলেন।

ব্যাপারটা যেন অজীগর্তের ভালো লাগল না,—না শুনঃশেফের আচরণ, না বিশ্বামিত্রের আচরণ। অজীগর্ত বিশ্বামিত্রকে ডেকে বললেন, 'ওহে ঋষি, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'না। আজ থেকে এ হল আমারই ছেলে! শুনঃশেফকে দেবতারা আজ আমার হাতেই দান করেছেন।'

অজীগর্ত তখন শুনঃশেফকে ডাকতে লাগলেন, 'শুনঃশেফ, ফিরে আয়। তোর বাপ-পিতামহের বংশ কত বড় বংশ—সে বংশ ত্যাগ করে যাস নে। আমার কাছে আবার ফিরে আয়।'

শুনঃশেফ বলল, 'তুমি বাবা হয়েও একশ'টা গোরুর লোভে ছেলেকে কাটতে এসেছিলে। শূদ্ররাও এমন ঘেন্নার কাজ করে না। তুমি চলে যাও—আমার বদলে তো তুমি তিনশ' গোরু পেয়েছ। আর কি!'

অজীগর্ত বললেন, 'আমি পাপ করেছি, দুঃখে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। তুই ফিরে আয়, যে তিনশ' গোরু পেয়েছি, সে তুই এসে নে।'

শুনঃশেফ গেল না। বলল, 'তুমি যে ঘেন্নার কাজ করেছ—তারপরে আমি আর ফিরতে পারি না। আমাদের পিতা-পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধ তুমিই চিরকালের জন্য ভেঙে দিয়েছ। তুমি ফিরে যাও।'

....

আদিকালের বাণী

বৃহদারণ্যক : ৫ম অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ থেকে

এ সেই সৃষ্টির আদিকালের কাহিনী। যা আছে তখন তাও ছিল না—যা নেই তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না—আকাশও ছিল না। মরণও ছিল না! জীবনও ছিল না, না ছিল রাতদিনেরও তফাত। ছিল কি? ছিল শুধু চারিদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আর জল আর জল।

তারপর আকাশ হল, পৃথিবী হল। পিতার পিতা পিতামহ ব্রহ্মা হলেন সকলের আদি পিতা। তিনিই জীবের সৃষ্টিকর্তা—তাই তাঁর নাম প্রজাপতি। তিনি সৃষ্টি করলেন গাছপালা, পোকামাকড়, পশুপাখি। সৃষ্টি করলেন দেবতা, মানুষ, অসুর।

ওই দেবতা, মানুষ আর অসুর—ওরা যেন তিন ভাই—প্রজাপতি ব্রহ্মার তিন ছেলে। ওরা বড় হতে লাগল এক সঙ্গে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠতে লাগল ওদের আলাদা আলাদা স্বভাব। দেবতারা ছিলেন শুভবুদ্ধি—সংযমী। মানুষেরা ছিল লোভী—যত পায় তত খায়—আরও তত চায়, চায় না শুধু দিতে। আর অসুরেরা ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির—দয়া মায়া তাদের বুকে নেই বললেই হয়। এরা তিন ভাই বড় হল—লেখাপড়ার বয়স হল। তখন পড়তে গেল বাপের আশ্রমে। গুরুর ঘরে যেমন করে সেকালে ছাত্ররা একাগ্র মনে ব্রহ্মচর্য করত তেমনি করে তিন ভাই পবিত্র মনে সংযম ধ্যান অভ্যাস করতে লাগল।

এমনি করে বছরের পর বছর—অনেক বছর কেটে গেল। তারপর দেবতাদেরই প্রথম মনে হতে লাগল—স্বভাব তাঁদের নির্মল হয়েছে, মনে এসেছে বিদ্যাশিক্ষার শক্তি। তাই তাঁরা একদিন প্রজাপতি ব্রহ্মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—নম্রভাবে বললেন, 'আমরা বছরের পর বছর—অনেক বছর ধরে ব্রহ্মচর্য করেছি। এবার আমাদের বিদ্যা দান করুন।'

ব্রহ্মা তাদের খুব বেশী কথা বললেন না—বললেন শুধু একটি মাত্র কথা, 'দ'।

ওই একটি মাত্র অক্ষরের উচ্চারণ শুনে দেবতারা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলেন। তাঁরা মনে মনে সকলেই বুঝতে পারলেন—'দ' মানে বোধ হয় 'দমন'। দীর্ঘ কয়েক বছর ব্রহ্মচর্য করতে গিয়ে তাঁরা এইটেই ভালো করে বুঝেছেন যে, রাগ, অহঙ্কার, লোভ ইত্যাদি দমন করাই হল সব শিক্ষাদীক্ষার মূল।

ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যা বললাম—তার মানে বুঝলে তো?'

দেবতারা বলে উঠলেন, 'বুঝেছি।'

ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝেছ?'

দেবতারা বললেন, 'দ-এর মানে দমন কর—দাম্যত। অর্থাৎ রাগ, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি দমনই যে সব তপস্যার মূল—এই কথাই আপনি বোধ হয় বলতে চান।'

তাঁদের কথা শুনে প্রজাপতি খুশী হয়ে বললেন, 'তোমরা ঠিকই বুঝেছ।'

তারপর ব্রহ্মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল একদিন সেই প্রথম মানুষের দল। তারাও দেবতাদের মত বলল, 'অনেক বছর ধরে আমরা ব্রহ্মচর্য করেছি—এবার আমাদের উপদেশ দিন।'

প্রজাপতি এবারও সেই একটি মাত্র অক্ষর বললেন, 'দ'।

মানুষেরাও মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলে। তারা ছিল স্বভাবত কিছুটা লোভী। তাদের লোভের যেন আর শেষ নেই—সীমা নেই; তাদের এটা চাই–ওটা চাই। শুধু চাই—চাই। তাই তারা এর জিনিস কাড়ে, ওর জিনিস কাড়ে, আর সঞ্চয় করে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধ্যান সংযম করে নিজেদের লোভী স্বভাবটার স্বরূপ তারা ভালো করেই বুঝেছে। তাই পিতামহের 'দ' অক্ষর শুনে তাদের মনে হল—প্রজাপতি তাদের লোভ ও সঞ্চয় ত্যাগ করে 'দান' করতে বললেন।

পিতামহ তাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি—বুঝলে আমার কথা?'

মানুষেরাও বলে উঠল, 'হ্যাঁ বুঝেছি।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝেছ?'

মানুষেরা বলল, 'দ-এর মানে দত্ত। অর্থাৎ দান কর, দান কর। ইঙ্গিতে এই কথাই আপনি বলেছেন।'

তাদের কথা শুনে প্রজাপতি খুব খুশী হলেন। বললেন, তোমরাও ঠিক বুঝেছ।'

তারপর সবশেষে এল অসুরেরা। দীর্ঘকাল ধ্যান সংযম করে তাদের মনও নির্মল ও পবিত্র হয়েছে। অসুরেরা প্রজাপতিকে বলল, 'এবার আপনি আমাদের উপদেশ দিন।'

প্রজাপতি তাদের শুধু সেই একটি অক্ষর বললেন, 'দ'।

অসুরেরাও মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলে প্রজাপতির 'দ' শব্দটি শুনে। মনে মনে ভাবতে লাগল তারা 'দ'-এর মানে। অসুরেরা ছিল দয়াহীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দীর্ঘকাল ধ্যান সংযম করার পর নির্মল পবিত্র মন নিয়ে তারাও বুঝতে পেরেছে—তাদের চরিত্রের দোষটা কোথায়। তাই প্রজাপতির 'দ' অক্ষর শুনে তারা বুঝে নিল—পিতা তাদের বোধ হয় দয়াশীল হতে বলেছেন। প্রজাপতি যেন ইঙ্গিতে বলে দিলেন—'নিষ্ঠুরতা ছেড়ে দয়া কর—দয়া কর, প্রাণীদের দয়া কর।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝতে পারলে—আমি কী বললাম?'

অসুরেরা এক সঙ্গে বলে উঠল, 'বুঝেছি।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন 'কি বুঝেছ বল দেখি?'

অসুরেরা বললে, 'দ-এর মানে দয়ধ্বম্। অর্থাৎ দয়া কর—দয়া কর। ইঙ্গিতে আপনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন।'

যাই হোক, তাদের কথা শুনেও প্রজাপতি খুব খুশী হলেন। হেসে বললেন, 'তোমরাও ঠিক বুঝেছ।'

সৃষ্টির সেই আদিকালে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির প্রথম উপদেশ পেয়েছিল দেবতা, মানুষ আর অসুর শুধু একটি মাত্র অক্ষরে। তারই মধ্যে দিয়ে দেবতা পেয়েছে দেবত্ব, লোভী মানুষ পেয়েছে অমরত্বের সন্ধান, আর নিষ্ঠুর অসুরের হয়েছে অসুরত্ব মোচন। আদিকালের সে

কথার আজও শেষ নেই। আকাশ যখন ছেয়ে আসে মেঘে মেঘে, অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক, মেঘের বুকে ঝিলিক মারে বিদ্যুৎ, তখন আদ্যিকালের সেই সৃষ্টিকর্তার বাণী আজও স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কাঁপিয়ে ফেটে পড়ে মেঘের ডাকে—'দ! দ! দ! দাম্যত! দত্ত! দয়ধ্বম্!' প্রজাপতি যেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সুদূর আকাশের মেঘের আড়াল থেকে আজও ঘোষণা করেন তাঁর অমর বাণী—দ! দ! দ! দমন কর! দান কর! দয়া কর!

....

শ্বেতকেতুর শিক্ষা

ছান্দোগ্য উপনিষৎ থেকে

ঋষি উদ্দালক ছিলেন ঋষিদের মধ্যে বড় একজন গুণবান পণ্ডিত। শ্বেতকেতু তাঁর ছেলে কিন্তু গুণবান পণ্ডিতের ছেলে হলে কি হবে, শ্বেতকেতু বার বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়ার ধার দিয়েও গেল না। অথচ ঋষির আশ্রমে বিদ্যার অভাব ছিল না। বিদ্যাচর্চার, জ্ঞানের নানান আলোচনার জায়গাই ছিল এইসব আশ্রম।

লোকালয়ের হট্টগোল থেকে দূরে শান্ত বনের ছায়ায় ঋষিরা কুটির বাঁধতেন। বনের হরিণ এসে ঋষিদের কুটির প্রাঙ্গনে চরে বেড়াত, কত রকমের পাখি এসে আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ চারদিকটি কলকূজনে ভরে তুলত। একেবারে উঁচু গাছটির ডালে বসে নীলকণ্ঠ পাখি ঋষিদের মতই ধ্যান করত। ইঁদুরেরা কাঠবিড়ালীর সঙ্গে মিতালী করত, বেড়াত তাদের দেখে হাই তুলত মাত্র—কিছু বলত না। প্রজাপতিরা কত রঙের ওড়না উড়িয়ে ফুলের বনে নেচে বেড়াত। এরই মধ্যে ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতেন, সকাল সন্ধ্যায় দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা গান করতেন। কত দূর দেশান্তর থেকে কিশোর বালক ছাত্ররা লেখাপড়া করতে আসত—আশ্রমের সকল রকম কাজ করে ছাত্ররা ঋষিদের সন্তুষ্ট করত; ঋষিরা তাদের বিদ্যাদান করতেন। কখনও বা গুরুতর বিষয়ে ঋষিদের মধ্যে তর্ক আলোচনা হত।

এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও শ্বেতকেতুর কিন্তু লেখাপড়া হল না। বরং আশ্রমের চারিদিকে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, কোথায় কোন পাখির বাচ্চা হয়েছে বা কোথায় কোন গাছে কি ফল পাকল তার খোঁজ করে করেই তার বারটা বছর কেটে গেল। হয়তো বা দূরের পাহাড়ের ঝরনায় ঘুরে ঘুরে, বাঁশি বাজিয়ে, শান্ত নদীর জলে সাঁতার কেটে দিন চলে যেতে লাগল।

তার ভাব-সাব দেখে ঋষি উদ্দালক ভাবনায় পড়লেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন—এখানে থাকলে শ্বেতকেতুর আর লেখাপড়া হবে না। তাই তাকে দূরে কোন গুরুর ঘরে পাঠাবার মতলব করলেন।

একদিন শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, 'বাছা শ্বেতকেতু, তোমাকে গুরুর কাছে গিয়ে লেখাপড়া করতে হবে।'

শুনে শ্বেতকেতুর মুখ শুকিয়ে গেল। হায় হায়! এখানকার বনের পাখি আর হরিণ, পাহাড় ঝরনা আর শান্ত নদীটির কোল—এ সব ফেলে তাকে কোথায় যেতে হবে! এ যে সে কোনও দিন ভাবেনি।

কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে, এ রকম বনে জঙ্গলে চিরদিন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালে কেউ যে তাকে আর ব্রাহ্মণ বলে কেয়ারই করবে না। সেকালে ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই আর ব্রাহ্মণ হওয়া যেত না।

ঋষি উদ্দালক তাই শ্বেতকেতুকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'ধ্যান সংযম করে সত্যিকার জ্ঞানী না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না শ্বেতকেতু! যাও, গুরুর কাছে ভালো করে লেখাপড়া শিখে এস।'

বাবার বকুনি খেয়ে শ্বেতকেতুর মনে বড় লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—রীতিমত সমস্ত কিছু শিখে ব্রাহ্মণ হয়ে তবে সে ঘরে ফিরবে।

একদিন সে সুদূর গুরুগৃহে যাত্রা করল। কাঠবিড়ালী দু'পা তুলে বনের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল—যাক, আপদ গেল, কেউ আর তাদের ল্যাজ কাটবে না। নীলকণ্ঠ পাখি মগডাল থেকে দেখে শান্তির নিশ্বাস ফেলল—যাক, তার বাচ্চাগুলো এবার আর বেঘোরে মারা পড়বে না। বুড়ো হরিণ কোমর সোজা করে দাঁড়াল—যাক, কেউ আর তার পিঠে চড়ে বাতের ব্যথাটা বাড়িয়ে দেবে না। দূর পাহাড়ের দামাল ঝরনাটি শুধু বলতে লাগল—ঝর ঝর—ধর ধর—কোথায় যাবে শ্বেতকেতু? তার পাশে পাশে এঁকে বেঁকে কুল কুল করে বয়ে চলল।

গুরুর ঘরে গিয়ে শ্বেতকেতু লেখাপড়ায় মন দিল। দীর্ঘ বারটি বছর গুরুর ঘরে থেকে সে নানা বিদ্যা শিখল। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ—আর্য ঋষিদের জ্ঞানের আধার যে বেদ, শ্বেতকেতু তা মুখস্থ করে ফেললে। এসব পড়ে শেষ করতে করতে তার বয়স হল চব্বিশ বছর। লেখাপড়া সাঙ্গ করে শ্বেতকেতু চব্বিশ বছর বয়সে সগর্বে ঘরে ফিরে এল। তার বাবা একদিন বলেছিলেন ব্রাহ্মণ হতে। এখন সমস্ত বিদ্যা একেবারে কণ্ঠস্থ করে সে সেই ব্রাহ্মণ হয়ে ঘরে ফিরেছে! এখন সে আর কারও চেয়ে খাটো নয়। বিদ্যার অহঙ্কারে কারও সঙ্গে সে ভালো করে কথাই বলল না।

তার অহঙ্কারী ভাব-সব দেখে ঋষি উদ্দালক আবার ভাবনায় পড়লেন।

কোথায় লেখাপড়া শিখে জ্ঞানলাভ করে শ্বেতকেতু বিনয়ী হবে, নম্র হবে—তা না হয়ে এ যে উল্টো হল! বিদ্যার অহঙ্কারে মাটিতে যেন আর পা পড়ে না! ব্রাহ্মণ বংশের এ যে আবার মহা আপদ!

ঋষি উদ্দালক মনে মনে খুব দুঃখিত হলেন। একদিন তিনি শুধোলেন, 'কি লেখাপড়া শিখে এলে শ্বেতকেতু? বেদ পড়েছ?'

শ্বেতকেতু সগর্বে উত্তর দিল, 'বেদ তো আমার কণ্ঠস্থ।'

তার উত্তর শুনে ঋষি উদ্দালক অবাক। তার গর্ব আর অহঙ্কার দেখে উদ্দালক বললেন, 'গুরু কি তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন?'

দু'একটি কথার পরই মহাজ্ঞানী উদ্দালক বুঝতে পারলেন, শ্বেতকেতু সমস্ত কিছুই মুখস্থ করে ফেলেছে হয়তো—কিন্তু বোঝেনি কিছু। তখন ঋষি আবার নিজেই শ্বেতকেতুকে সমস্ত কিছু বোঝাতে বসলেন। শ্বেতকেতু হাঁ করে শুনতে লাগল। পৃথিবী, পশুপাখি, গাছপালা, মানুষ, মানুষের প্রাণ, বাক্য, মন—এমনি কত বিষয়ে ঋষি বোঝাতে লাগলেন। শ্বেতকেতু কিছু বা বুঝলে—কিছু বা বুঝলে না।

একদিন ঋষি বললেন, 'শ্বেতকেতু, আমাদের মন হল অন্নময়—অন্নতেই মনের শক্তি।'

না বুঝে শ্বেতকেতু হাঁ করে চেয়ে রইল।

কোথায় অন্ন আর কোথায় মন! অন্ন হল ক্ষুধার খাদ্য যা দিয়ে পেট ভরাই! বাস্—সেইখানেই তো তার কর্ম শেষ। এই তো তার সামান্য পেট ভরানোর কাজ। আর মন হল কত বড়! কত বড় বড় তার কাজ! জগতের কত বড় বড় সৃষ্টি, কত বিরাট জ্ঞানের সৃষ্টি এই মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্ন আর মন—একটা কত ছোট আর একটা কত বড়! এদের সম্পর্ক কি? শ্বেতকেতুর মুখের ভাব বোকা বোকা।

উদ্দালক তার ভঙ্গী দেখে বললেন, 'বুঝলে?'

শ্বেতকেতু ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে না। আর একবার বলুন।'

উদ্দালক বললেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা তোমাকে সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি পনের দিন উপবাস কর। কোনও অন্ন খাবে না। শুধু তেষ্টা পেলে একটু করে জল খেয়ো।'

বেচারী শ্বেতকেতু তো উপবাস শুরু করে দিল। এক দিন দু'দিনের উপবাস নয়, এ একেবারে একটানা পনের দিন।

যাই হোক, এক দিন দু'দিন করে বেচারী শ্বেতকেতুর পনেরটা দিন তো কোন রকমে কেটে গেল। এই পনের দিনে তার দেহের জোর কমে গেল—গায়ের রঙ হল কালি। পনের দিন পরে কোন রকমে ধুঁকতে

ধুঁকতে সে বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কথা বলতে গেল—কিন্তু গলা দিয়ে ভাল করে স্বর ফুটল না। কোনও রকমে বললে, 'বাবা, এখন আমায় কি বোঝাবে?'

ঋষি উদ্দালক বললেন, 'বেদ তো তোমার কণ্ঠস্থ। এখন তার মন্ত্র-গুলো সব এক এক করে বল দেখি।'

শ্বেতকেতু চোখে অন্ধকার দেখল। মন্ত্রগুলি মনে করবার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়, কিছুই যে মনে পড়ে না! মন বড় দুর্বল। ভাবতে ভাবতে তার মাথা ঘুরতে লাগল। পনের দিন উপবাস করে মনের আর কোন শক্তিই নেই। শ্বেতকেতু চিঁ-চিঁ করে বললে, 'বাবা, আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না।'

ঋষি উদ্দালক বললেন, 'তবেই এবার বোঝ, না খেয়ে খেয়ে মন তোমার কত দুর্বল হয়ে গেছে! এখন যাও দেখি—ভাল করে পেট ভরে চারটি খেয়ে এস।'

শ্বেতকেতু এবার মায়ের কাছে গিয়ে বেশ করে পেট ভরে খাবার খেল। কি আশ্চর্য! পেট ভরবার পরই মন সতেজ হয়ে উঠল। তখন সে আবার বাপের কাছে ফিরে এল। উদ্দালক ঋষি এবার বেদের মন্ত্র জিজ্ঞাসা করতেই সে দিব্যি গড়গড় করে বলে গেল।

ঋষি তখন বললেন, 'এবার দেখ, পেটে দুটি অন্ন পড়বার পর তোমার দুর্বল মন সতেজ হয়ে উঠেছে। তাই বলেছিলাম বাপু, অন্নতেই মনের শক্তি, মন অন্নময়। বুঝলে এবার?'

পনের দিন উপবাসের পর চারটি পেট ভরে খেয়ে তখন শ্বেতকেতুর শরীর আইঢাই করছে। মন যত ভাবের ভাবনাই ভাবুক—অন্ন যে কি, আজ সে মর্মে মর্মে বুঝেছে। অন্ন না থাকলে মনের যে কি অবস্থা হয়—তা আর তার বুঝতে বাকী নেই। তাই সে বাপের কথার উত্তরে চটপট মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝেছি।'

....

পদচিহ্নকুশলী

জাতক থেকে

সে এক ঘোরঘুট্টি বন—আড়ে পাঁচ যোজন তো দীর্ঘে তিরিশ যোজন। তার মধ্যে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। গাছে-গাছে ডালে-পালায় লতায়-পাতায় অন্ধকার। যেন বাতাসও ঢুকতে পারে না। গাছের ডালে ঝাপটা দিয়ে বাতাস যত বলে 'সর সর' সারাক্ষণ গাছের পাতাগুলো ততই বলে 'মর্ মর্—মর্ মর্'।

এ ঘোরঘুট্টি বন ছিল এক যক্ষিণীর রাজত্ব--মুখটা ছিল তার ঘোড়ার মত বিশ্রী। এই বনের বুক চিরে দূরের রাজপুরীর দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। সে পথ দিয়ে যত লোক আসত যেত—ঘোড়ামুখী যক্ষিণী তাদের সব ধরে ধরে খেত। বনের এক পাশে ছিল মস্ত একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের এক গুহায় ছিল যক্ষিণীর আস্তানা। তার আস্তানার সামনে নরকঙ্কালের আরও একটা ছোট পাহাড়—তাতে যে কত মানুষের হাড়গোড় আছে তার লেখা-জোখা নেই।

একদা এক ধনবান সুদর্শন ব্রাহ্মণ অনেক লোকলস্কর সঙ্গে করে ওই পথে আসছিলেন। যেমনি তাকে দেখা, অমনি যক্ষিণী হা-হা করে বিকট শব্দে হাসতে হাসতে ছুটে এল। এক-এক যোজন এক-এক পলকে পার। ব্রাহ্মণের লোকলস্কর প্রাণভয়ে কে কোথায় ছুটে পালাল। ব্রাহ্মণই শুধু যক্ষিণীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। যক্ষিণী তাকে পিঠে করে নিজের গুহায় নিয়ে এল।

আনল বটে কিন্তু খেল না। ব্রাহ্মণকে যক্ষিণী বিয়ে করল। সেদিন থেকে যক্ষিণীর মন কেমন বদলে গেল। সেদিন থেকে সে যত মানুষ ধরে আনত, তাদের চাল-ডাল কাপড়-চোপড় যা থাকত তা দিয়ে ব্রাহ্মণকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখবার চেষ্টা করত—আর নিজে মানুষগুলোকে খেত। যখন সে মানুষ ধরতে বের হত, তখনই শুধু গুহার মুখে বড় একখানা পাথর চাপা দিয়ে যেত পাছে ব্রাহ্মণ পালায়।

এমনি ভাবে ব্রাহ্মণ আর যক্ষিণী ওই পাহাড়ের গুহায় কাল কাটাতে লাগল। তারপর অনেক দিন পরে বোধিসত্ত্ব তাঁর এক পূর্বজন্মে তাদের ছেলে হয়ে জন্মালেন। ছেলের চাঁদমুখ দেখে যক্ষিণীর আনন্দ আব ধরে না। তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, কত আদর করে। এদিকে নানা ভাবে ব্রাহ্মণের সে সেবা করে। কিন্তু গুহার বাইরে যখন মানুষ ধরতে যায়, তখন গুহার মুখে সেই বড় পাথরখানা চাপা দিয়ে যায়।

দিনে দিনে বোধিসত্ত্ব বড় হলেন। তাঁর জ্ঞান আক্কেল বাড়ল ধীরে ধীরে—গায়ে হল অসীম জোর। একদিন তিনি গুহার মুখের পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তারপর বাপের সঙ্গে গুহার বাইরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন।

যক্ষিণী ফিরে এসে শুধাল, 'পাথর সরাল কে?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি সরিয়েছি মা।'

ছেলেকে যক্ষিণী বড় ভালোবাসত—তাই সেদিন আর সে কিছু বলল না।

এর পর বোধিসত্ত্ব একদিন বাপকে শুধোলেন, 'আচ্ছা বাবা, তোমাকে দেখতে এক রকম—মাকে দেখতে আর এক রকম। কেন বাবা?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'তোর মা যক্ষিণী—রাক্ষসী; মানুষ খায়। তার চেহারা তাই ওই রকম। আর আমরা হলাম দুজনে মানুষ।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তা হলে আমরা এখানে থাকব কেন? চল বাবা, যেখানে মানুষ থাকে সেখানে আমরা পালাই।'

শুনে ভয়ে ব্রাহ্মণের বুক কেঁপে উঠল। বললেন, 'আমরা যদি পালাবার চেষ্টা করি তা হলে তোর মা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই বাবা। তুমি ভেব না। তোমাকে লোকালয়ে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর রইল।'

পরের দিন যক্ষিণী যখন বাইরে গেল তখন বোধিসত্ত্ব বাপকে সঙ্গে করে পালিয়ে গেলেন।

দুরন্ত বন—কোনও দিকে মানুষজনের ঘর-বসতি জানা নেই। বোধিসত্ত্ব ছুটলেন আগে আগে। মানুষের সমাজে মানুষ ফিরবে—তাঁর আনন্দের সীমা নেই। বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললেন তাঁরা—এক দিন —দুই দিন—তিন দিন।...যোজন যোজন বন যেন আর শেষ হয় না।

এদিকে যক্ষিণী নিজের গুহায় ফিরে দেখল—কোথায় ছেলে, কোথায় স্বামী। গুহা শূন্য। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে যক্ষিণী ছুটল বায়ুবেগে। পলকে যোজন পার। এক জায়গায় গিয়ে ধরে ফেলল ছেলে আর স্বামীকে। ব্রাহ্মণকে বলল, 'কেন পালাচ্ছ তুমি? তোমার কিসের অভাব বল।'

ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমাকে কিছু বল না — দোহাই। তোমার ছেলেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

ছেলেকে বড় ভালোবাসত বলে সেদিনও যক্ষিণী কিছুই বলল না। দুজনকেই অনেক রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের গুহায় আবার ফিরিয়ে আনল।

বোধিসত্ত্ব এবার নূতন ফন্দি আঁটতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক করলেন—মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন, তার রাজত্বের সীমা কতদূর। একবার সেই সীমার বাইরে যেতে পারলে আর তাদের পায় কে!

একদিন তিনি মাকে বললেন, 'আচ্ছা মা তোমার রাজ্য তো আমিই পাব!'

যক্ষিণী বলল, 'পাবি বই-কি বাবা, আমার আর কে আছে!'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তবে বল—তোমার রাজ্যের সীমা কতখানি।'

যক্ষিণী ছেলের মতলব না বুঝে সব বলে ফেলল, 'ওই যে একটা পাহাড় দেখা যায়, তার পাশে আছে এক নদী। ওই নদীর জল পর্যন্ত
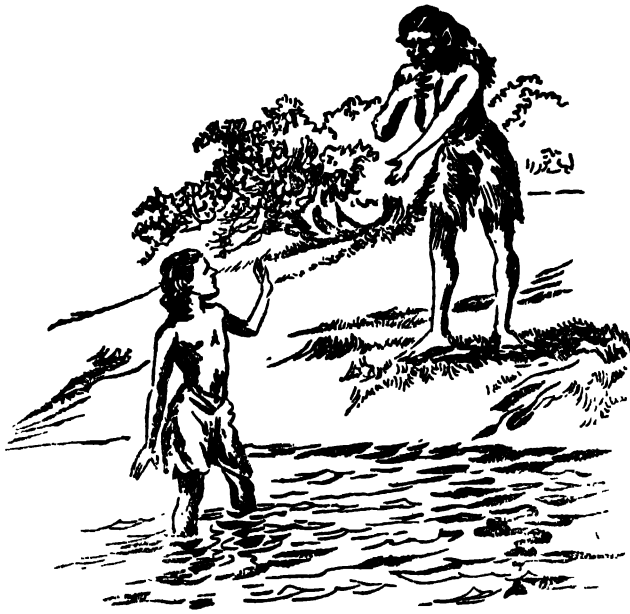
আমার সীমা। জলে নেমে পড়লে তাকে ধরতেও পারি না—ছুঁতেও পারি না। তবে তার এপাশে আড়ে পাঁচ যোজন আর দীর্ঘে তিরিশ যোজন—এর মধ্যে সব আমার !'

এরপর বোধিসত্ত্ব কয়েকদিন চুপচাপ থাকলেন।

এক দিন, দুই দিন করে তিন দিন কেটে গেল। তিন দিন পরে যক্ষিণী যখন আহারের খোঁজে বনে বের হয়ে গেল তখন বোধিসত্ত্ব আবার বাপকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেই পাহাড় আর নদী লক্ষ্য করে বায়ুবেগে ছুটতে লাগলেন। এত ছুটেও যেন পথের শেষ নেই। কত দূর—ওগো আরও কত দূর সেই পাহাড় আর নদী !...

এদিকে যক্ষিণী গুহায় ফিরে দেখে—গুহা শূন্য। তখন সে-ও পাগলের মত ছুটতে লাগল। কোথায় ছেলে—কোথায় স্বামী? যক্ষিণী ডাক পাড়তে পাড়তে ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। আর পলকে যোজন পার।

বোধিসত্ত্ব তার দিগন্তভেদী ডাক শুনতে পেয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হল—পিছনে যেন একটা ঝড় ছুটে আসছে ! আর

বুকফাটা কান্নায় যোজনবিস্তৃত বনভূমি কাঁপতে লাগল—আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল।

যক্ষিণী যখন সেই পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে এসে পৌঁছল, তখন বোধিসত্ত্ব জলে নেমে পড়েছেন—ব্রাহ্মণও মরি-বাঁচি করে সাঁতার কাটছেন।

রাজ্যের সীমানার বাইরে যক্ষিণীর আর হাত নেই। সে তখন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকতে লাগল, 'বাছা উঠে আয়। ফিরে আয় তোর বাপকে নিয়ে। আমি তোদের কোন্ কাজটা করি না বল্। ফিরে আয়—ফিরে আয়।'

স্বামীপুত্রকে সে বার বার ডাকতে লাগল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলেন। যক্ষিণী তখন ছেলেকেই ডাকতে লাগল, 'এমন কাজ করিস না বাছা—তুই ফিরে আয়।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মা, আমরা মানুষ—তুমি যক্ষিণী। তাই চিরকাল তোমার কাছে আমরা কেমন করে থাকব?'

'তবে ফিরবি না বাছা?' যক্ষিণী কেঁদে ফেলল।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'না।'

যক্ষিণী বলল, 'ওরে বাছা—মানুষের মধ্যে বাস করতে হলে বড় দুঃখ—বড় কষ্ট পেতে হয়।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তবু সেই ভালো। আমরা মানুষ।'

যক্ষিণী বলল, 'সেখানে যারা কোনও বিদ্যে জানে না, তারা তিষ্ঠোতে পারে না। যদি একান্তই যাবি—তবে তোকে একটা বিদ্যে শিখিয়ে দিই—শিখে যা।'

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে থেকেই বললেন, 'বল।'

যক্ষিণী একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিল। মন্ত্রের নাম চিন্তামণি বিদ্যা। বলল, 'এই বিদ্যের বলে বার বছর আগেও যে লোক চলে গেছে তার পায়ের চিহ্ন দেখতে পাবি। মানুষের মাঝখানে তুই এই বিদ্যে ভাঙিয়েই খেতে পরতে পাবি।'

বোধিসত্ত্ব বিদ্যে গ্রহণ করে দূর থেকেই মাকে জোড় হাতে প্রণাম করলেন। বললেন, 'এবার তবে যাই মা।'···

যক্ষিণী ডাক পেড়ে কেঁদে উঠল, 'ওরে, তোরা না থাকলে আমি বাঁচব না—আমি বাঁচব না।'···

এই বলে যক্ষিণী সজোরে বুক চাপড়াতে লাগল। পুত্রশোকে বুক ফেটে সে সেখানেই পড়ে গেল, আর উঠল না।

মায়ের মৃত্যু দেখে বোধিসত্ত্ব থমকে দাঁড়ালেন। ওপার থেকে বাপকে ডাকলেন। তারপর দুইজনে যক্ষিণীর মৃতদেহ সৎকার করে নদী পার হয়ে চললেন বারাণসীর দিকে।

বারাণসীতে এসে বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজের কাছে খবর পাঠালেন—একজন পদচিহ্নকুশলী এসেছে।

রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

রাজসভায় ঢুকে বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করলেন।

রাজা শুধালেন, 'তুমি কি বিদ্যে জান?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, বার বছর আগেও যে জিনিস চুরি গেছে—চোরের পদাঙ্ক দেখে তা আমি বার করে দিতে পারি।'

'বেশ।' রাজা বললেন, 'আজ থেকে তবে তুমি আমার কাজে বহাল হলে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন 'কিন্তু মহারাজ, আমার বেতন রোজ হাজার টাকা।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, তাই তুমি পাবে।'

রাজার আদেশে রোজ তাঁকে হাজার টাকা বেতন দেওয়া হতে লাগল।

রাজপুরোহিতের কিন্তু এটা ভালো লাগল না। কে না কে—কি তার বিদ্যে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল!

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, লোকটির বিদ্যের পরীক্ষা হোক। সত্যিই ও কোনও বিদ্যে জানে কিনা কে জানে।'

রাজা বললেন, 'বেশ, পরীক্ষা হোক।'

তখন দুই জনে অনেক শলাপরামর্শ করে রাজ-ভাণ্ডার থেকে বহু-মূল্য মণিমানিক নিয়ে প্রাসাদ থেকে নামলেন। সোজা পথে নামলেন না—নামলেন অনেক ঘুরপাক খেয়ে। অন্ধকারে তিনবার রাজপ্রাসাদ বেড় দিলেন, তারপর পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে মই ফেলে নীচে

নামলেন। আবার উঠলেন, আবার নামলেন। আবার উঠলেন, আবার নামলেন। তারপর রাজপুরীর মধ্যে যে সরোবর আছে তার চারপাশে তিনবার ঘুরলেন। শেষকালে মণিমানিকের পেটিটি সরোবরের মাঝখানে পুঁতে রাখলেন। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালবেলা সোরগোল পড়ে গেল—রাজ-ভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য মণিমানিক সব চুরি গেছে। রাজপ্রাসাদ তোলপাড়—রাজপুরী তোলপাড়। রাজ্যের লোক 'হায় হায়' করতে লাগল।

রাজা যেন কিছুই জানেন না—এই ভাবে বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'রাজভবন থেকে বহু রত্ন চুরি গেছে। এখন তোমার বিদ্যার গুণ দেখাও।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ', বলে বোধিসত্ত্ব নির্জনে গিয়ে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতেই বহু ঘুরপাক-খাওয়া পায়ের দাগ সব দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, দুজন চোরের পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি।'

রাজা বললেন, 'চোর ধর।'

রাতের বেলা রাজা আর রাজপুরোহিত যেমন যেমন ঘুরপাক খেয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব ঠিক সেইভাবে তাঁদের পায়ের দাগ দেখে দেখে চললেন। শেষ পর্যন্ত সরোবরের মাঝখান থেকে রত্নের পেটি উদ্ধার করে এনে দিলেন।

ব্যাপার দেখবার জন্য তখন রাজ্যিসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে। বোধিসত্ত্বের বাহাদুরি দেখে সকলে হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হল—কে জানে, এ লোকটা রাত্রির ব্যাপার হয়তো সবই দেখেছে। তাই তিনি বললেন, 'রত্ন তো পাওয়া গেল—এখন চোর ধরে দাও দেখি।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, চোর বড় পদস্থ। সে চোর না ধরাই ভালো।'

রাজা বললেন 'কেন?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তো নিস্তার নেই। চোর সেই রক্ষক।'

রাজা বললেন 'তোমার ঠারে ঠুরে অত কথা বুঝি না। তুমি তোমার বিদ্যের জোরে হাতে-নাতে চোরটি ধরে দাও। ব্যস্।'

ওদিকে রাজ্যের লোকও তখন সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'দাও —চোর ধরে দাও। চোরকে আমরা শাস্তি দেব।'

বোধিসত্ত্ব রাজাকে বাঁচাবার জন্য বললেন, 'ঠারে ঠুরে আবার বলছি মহারাজ, যিনি সকলের ধন রক্ষার কর্তা—চোর তিনিই। এর বেশী আর জানতে চাইবেন না।'

রাজা বললেন, 'বাপু, আমি তোমার ঠার-ঠুর বুঝি না। হয় চোর ধরে দাও—নয় বুঝব, তুমিই চোর। তুমিই চুরি করে সরোবরের মাঝখানে ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলে।'

রাজার কথা শুনে ক্রুদ্ধ জনতা বোধিসত্ত্বের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল।

বোধিসত্ত্বও রাজার অপমানকর কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'তবে কি মহারাজ একান্তই চোর ধরতে চান?'

রাজা বললেন, 'চাই বই-কি!'

রাজ্যের লোকও একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'চাই।'···

বোধিসত্ত্ব মনে মনে বললেন, 'আমি এই রাজাকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলাম—কিন্তু বুদ্ধির দোষে ইনি তা করতে দিলেন না'। তারপর তিনি রাজ্যের সমস্ত লোককে ডেকে বললেন, 'তোমরা তবে শোন, যাঁরা এতদিন তোমাদের উপকার করতেন, এখন তাঁরাই হয়েছেন তোমাদের ভয়ের কারণ। তোমাদের সম্পত্তিই রাজার সম্পত্তি—রাজা তোমাদের সম্পত্তির রক্ষক মাত্র। এখন সেই রাজা আর তাঁর পুরোহিত মিলে রাজ্য লুঠ করতে নেমেছেন। রক্ষক আজ ভক্ষক। অতএব তোমরা এবার আত্মরক্ষা কর।'

শুনে প্রজাসাধারণ ক্ষেপে উঠল। কি! রাজা নিজে চুরি করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান! অতএব ইনি যাতে আর এরকম চুরি না করেন তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজাকে,'—এই বলে সকলে রাজা ও রাজপুরোহিতকে লাঠি ঢিল মুগুর—হাতের কাছে যে যা পেলে তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। মারের চোটে রাজা ও রাজপুরোহিত তো সেখানেই মারা গেলেন। তারপর প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করে নিল।

করুণা

জাতক থেকে

একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ গভীর রাতে ভয়ানক শব্দ শুনে জেগে উঠে বসলেন। কারা যেন সব কান্নাকাটি করছে। তারপর আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকী রাতটা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় কাটল। তাঁর মনে হল— এ সমস্ত অমঙ্গল শব্দ শোনার পর মানুষ আর বাঁচে না। এ অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে হলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকিয়ে কিছু একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা দরকার। এইসব ভেবে কোশলরাজ ভোর ভোর গিয়ে হাজির হলেন জেতবনে যেখানে ধ্যান করছিলেন গৌতম বুদ্ধ।

কোশলরাজ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, নানা রকম অশুভ শব্দ শুনেছি। আমার কোনও বিপদ হবে না তো?'

বুদ্ধদেব হেসে বললেন, 'কেবল আপনিই যে এইরকম কান্নাকাটি শুনেছেন তা নয়, অতীতেও রাজারা এইরকম অনেক শব্দ শুনেছেন। শুনুন তবে একবারের কথা বলি।'

কোশলরাজ এবং বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য দুজন—আনন্দ ও সারিপুত্র, আরও অনেক শিষ্য বুদ্ধদেবের কথা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

বুদ্ধদেব তাঁর আগের এক জন্মের কথা বলতে লাগলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন খুব বড়লোক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন। তিনি যখন বড় হলেন এবং তক্ষশিলায় গিয়ে সব লেখাপড়া সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরে এলেন তখন তাঁর বাপ-মা মারা গেলেন। বোধিসত্ত্ব তারপর আর সংসারে থাকলেন না। বাবার সব ধন-দৌলত বিলিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ে তপস্যা করতে। বেশ কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাসী

হয়ে বারাণসীতে ফিরে এসে রাজার বাগানের এক কোণে এক গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

এইসময়ে একদিন বারাণসীরাজ গভীর রাতে আট রকমের শব্দ শুনতে পেলেন—পশুপাখি আর মানুষের কান্না। কোথায় যেন একটা বক আর্তনাদ করে উঠল। তারপর একটা কাক করুণ ভাবে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুণ-পোকা কোথায় কট্‌কট্‌ করে উঠল। তারপর একটা কোকিল যেন কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পরে একটা হরিণ আর একটা বানর বড় করুণ শব্দ করে উঠল। তারপর একটা কিন্নরের কান্না—এ এক অদ্ভুত জীব, শরীরটা মানুষের মত কিন্তু মুখটা ঘোড়ার ঢঙ। কিন্নরের বড় বেদনাপূর্ণ অস্পষ্ট করুণ কান্নায় রাজা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সব শেষে এক সন্ন্যাসী যেন মরবার সময়ের একটা শেষ প্রার্থনা-গান গেয়ে থেমে গেল।

চারদিকে ঘুটঘুটি অন্ধকার! কেউ কোথাও নেই—অথচ কান্নার শব্দ আসছে! বারাণসীরাজ রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না। নানা দুশ্চিন্তায়, নানা অমঙ্গলের ভয়ে তাঁর বাকী রাতটুকু কাটল।

পরের দিন সকালে বারাণসীরাজ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতে তিনি বললেন, 'বলুন—এসব কান্নাকাটির মানে কি?'

ব্রাহ্মণেরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে বললেন, 'মহারাজ—এসব ভয়ানক খারাপ। আপনার ভয়ানক বিপদ দেখছি। আপনাকে খুব বড় যজ্ঞ করতে হবে।'

রাজা বললেন, 'ঠিক আছে। করুন, কত বড় যজ্ঞ করবেন।'

তখন ব্রাহ্মণেরা মহা আনন্দে যজ্ঞের আয়োজন করতে লেগে গেলেন। এল হাজার মণ ঘি, হাজার হাজর পশু—বলি পড়বে। চারদিকে ব্রাহ্মণের হাঁকডাক আর তার মাঝখানে বলির পশুগুলোর আর্তনাদ—সবটা মিলে খুব হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি প্রধান পুরোহিত—তাঁর এক শিষ্য ছিল, তার বয়স অল্প। পশুগুলোর করুণ আর্তনাদে তার ভয়ানক খারাপ

লাগছিল। সে তার গুরুকে গিয়ে বললে, 'গুরুদেব, এতগুলো প্রাণীকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলবেন না।'

গুরুদেব বললেন, 'তুমি কি জান বাপু? তোমার কাজ হল—রাজার ধন ঘাড়ে করে ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখ না, আমরা কত মাছ মাংস খেতে পাব।'

শিষ্য বললে, 'গুরুদেব, শুধু খাওয়ার জন্য এ পাপ করবেন?'

তার কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণ চটে গেল।

'বেশ, আপনারা তবে মাছ মাংস খাওয়ার যোগাড় করুন।' এই বলে সেই তরুণ শিষ্য রাজবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে নামল। মনে মনে ভাবতে লাগল—এমন কোনও সন্ন্যাসী কি নেই যিনি এসে রাজাকে বোঝাতে পারেন।

বেচারী একা একা মন খারাপ করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল রাজার বাগানে ; সেখানে দেখা হয়ে গেল বোধিসত্ত্বের সঙ্গে। তপস্বী বোধিসত্ত্ব তো আগে থেকেই বাগানের এক গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে আছেন। তরুণ শিষ্যটি তাঁকে প্রণাম করে বললে, 'রাজা বহু প্রাণী হত্যার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে কি বাধা দেওয়া উচিত নয় ?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'নিশ্চয়ই উচিত।'

তরুণ শিষ্য বললে, 'রাজা কি সব অশুভ শব্দ শুনেছেন—তারই জন্য এই পশুহত্যার ব্যবস্থা। আপনি কি সেই সব শব্দের ফলাফল জানেন ?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'জানি !'

তখন তরুণ শিষ্যটি ছুটল আবার রাজবাড়িতে। রাজাকে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, আপনার বাগানে একজন তপস্বী আশ্রয় নিয়েছেন—তিনি আপনার ওই অমঙ্গলকর শব্দগুলির ফলাফল জানেন।'

'জানেন !' রাজা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন সেই তপস্বী বোধিসত্ত্বের কাছে। তপস্বীকে প্রণাম করে রাজা বললেন, 'বলুন—সে সব শব্দের কি ফলাফল।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, ওই সব শব্দ শুনে আপনার কোনও অমঙ্গল হবে না। আপনি প্রথমে যে বকের শব্দ শুনেছিলেন সে বকটি আছে আপনার পুরানো বাগানে। সে খিদেয় চীৎকার করে কাঁদছিল। কেঁদে বলছিল—'হায়, এখানে আমার বাপ-পিতামহ সুখে জীবন কাটিয়ে গেছে। এক সময়ে এখানে সুগভীর সরোবর ছিল—কিন্তু আজ তাতে জল নেই, তাই তাতে মাছও নেই। আজ আমি খেতে পাই না। অথচ এই পুরানো ঘরের মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন চায় না।'

বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, বকের এই খিদের কান্না যদি থামাতে চান তাহলে আপনার পুরানো বাগান আর তার সরোবর সংস্কার করুন।'

রাজা অমনি মন্ত্রীকে সেই আদেশ দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তারপর শুনেছেন আপনি কাকের শব্দ। ওই কাকটি আপনার হাতীশালের দরজার ওপরে বাসা করেছে। কিন্তু তার যতবার বাচ্চা হয় ততবারই আপনার মাহুত হাতী নিয়ে বেরুবার সময় তার বাসাটা ভেঙে দেয় তাই সে দুঃখে কাঁদছিল। আপনি মাহুতকে সাবধান করে দিন।'

রাজা তক্ষুনি মাহুতকে ডেকে তাকে বরখাস্ত করে দিয়ে নতুন মাহুত নিযুক্ত করলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, তারপর আপনি শুনেছেন একটা ঘুণ-পোকার কাঠ কাটা কটকট শব্দ। আপনার প্রাসাদের যে কাঠের চুড়ো—তার মধ্যে আছে একটা ঘুণ-পোকা। সে এতদিন কাঠের অসার ভাগটা খেয়ে ফেলেছে। সার খাওয়ার শক্তি তার নেই। তাই সে দুঃখে কাঁদছিল! ঘুণ-পোকাটাকে বের করে দিন।'

রাজার আদেশে লোকলস্কর ছুটল ঘুণ-পোকাটা বের করবার জন্য।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এর পরে আপনি শুনেছেন একটা কোকিলের শব্দ। আপনার একটা পোষা কোকিল আছে?'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ প্রভু, আছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কাল রাত্রে সেই কোকিলটা হঠাৎ তার জন্মভূমি দূরের এক বনের কথা ভেবে দুঃখ করে বলছিল—

এ রাজভবন থেকে মুক্তিলাভ করে হায়, বনে কি ফিরবো আমি আর।
শাখা-পল্লবের কুঞ্জে গান গেয়ে কত সুখ ফিরে পাবো আনন্দ আমার।।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, ওর মনে বড় দুঃখ, কোকিলটাকে ছেড়ে দিন।'

রাজা কোকিলটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, তারপর আপনি শুনেছেন আপনারই পোষা হরিণটার করুণ ডাক। এই হরিণটি যখন বনে ছিল, তখন সে ছিল তার দলের নেতা। সে তার সঙ্গী বন্ধুদের কথা মনে করে কেঁদে কেঁদে বলছিল—'যদি একবার মুক্তি পাই তাহলে, আবার সেই বনে গিয়ে সকলের আগে আগে মনের সুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। সেখানে

ছিলাম আমি যূথপতি—আর এখানে আমি বন্দী। মহারাজ, হরিণটিকে মুক্তি দিন।'

রাজা লোক পাঠালেন হরিণটিকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসবার জন্য।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনার বাড়িতে একটা পোষা বানর আছে?'

রাজা বললেন 'আছে, প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ওই বানরটি ছিল হিমালয় পর্বতের এক বনে—বানরদের এক দলের নেতা। ভরত নামে এক ব্যাধ তাকে ধরে এনেছে আপনার কাছে। সে দুঃখ করে কাঁদছিল—

ভরত ব্যাধের জাত আমারে এনেছে ধরে হায়।
তোমার মঙ্গল হবে, ছেড়ে দাও দয়া করে, এ যন্ত্রণা সহা নাহি যায়॥

মহারাজ, ওর দুঃখ হরিণেরই মত। ওকে ছেড়ে দিন।'

রাজা তাকেও মুক্তি দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, আপনি একটি কিন্নর ধরে এনে রেখেছেন?'

রাজা বললে, 'হ্যাঁ।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ওই কিন্নর তার ঘরের কথা, তার স্ত্রীর কথা ভেবে ভেবে কাঁদছিল। কোথায় পড়ে আছে তার স্ত্রী হিমালয়ের কাছে। আপনি ওকেও মুক্তি দিন।'

রাজা তাকেও মুক্তি দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শেষ শুনেছেন আপনি এক তপস্বীর অন্তিম প্রার্থনা গান। আপনার বাগানে এসে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তিনি ইহজন্মের দুঃখ থেকে পার পেয়ে নির্বাণ লাভ করেছেন। সেই আনন্দে তিনি তাঁর শেষ প্রার্থনা গানটি গেয়ে উঠেছিলেন। চলুন মহারাজ, তাঁর শেষ কাজ করে আসি। আপনার কোনও শব্দ থেকে কোনও অমঙ্গল হবে না। চলুন।'

রাজা তাঁর লোকলস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির হলেন সেই তাপসের মৃতদেহের কাছে। ফুল-চন্দন-মালা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন তাঁর দেহ। আর বোধিসত্ত্বের উপদেশে তিনি বলির পশুগুলিকে সব ছেড়ে দিলেন।

ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দিলেন সেই দিনই—আজ থেকে কেউ আর প্রাণিহত্যা করবে না।

পূর্বজন্মের কথা শেষ করে বুদ্ধদেব কোশলরাজকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কোনও ভয় নেই। অতীতে রাজাদের ভয় দেখিয়ে ব্রাহ্মণরা অনেক বড় বড় যজ্ঞের আয়োজন করতেন, অনেক প্রাণী হত্যা করতেন, অনেক মাছ-মাংস খেয়ে পেট ভরাতেন। ভয় না করে আপনি প্রাণীদের ভালবাসুন—যজ্ঞের নামে তাদের আর বলি দেবেন না। মিথ্যে ভয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে কি হবে ?'

....

বিশাখা

বৌদ্ধকথা ধম্মপদ থেকে

একবার কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাজা বিম্বিসারের কাছ থেকে একজন বড় শ্রেষ্ঠীকে চেয়ে এনে বসালেন নিজের রাজ্যে। কারণ, সেকালে শ্রেষ্ঠীই ছিল রাজ্যের গৌরব, রাজার ভূষণ, যেমন জনপদ রাজপুরীর শোভা।

শ্রাবস্তীর কিছুদূরে সাকেত। সেখানে এক মনোরম জায়গা দেখে কোশলরাজ শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের জন্য তৈরি করে দিলেন সুন্দর এক নগরী। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী সেইখানে সপরিবারে সুখে বসবাস করতে লাগল।

ধনঞ্জয়ের একমাত্র মেয়ে বিশাখা—চাঁদের কণা ছেনে তার রূপ। শ্রেষ্ঠী তাকে মানুষ করে তুলতে লাগল মনের মত করে। বাড়িতে আসে আচার্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা—তাঁদের আদর্শ আর উপদেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল বিশাখা।

সেই রাজ্যে বাস করত আর একজন সওদাগর—নাম তার মিগার শ্রেষ্ঠী, তার ছেলের নাম পূর্ণবর্ধন। তেমন নাম ডাক নেই মিগার শ্রেষ্ঠীর—সওদাগর সে ছোটই। কিন্তু ছোট হলে হবে কি, মনের আশা তার আকাশ-প্রমাণ। একদিন ভাটদের ডেকে বলল, 'পূর্ণবর্ধনের বিয়ে দেব—খুঁজে আন সেই কন্যে—হাঁটু সমান যার কেশ, মুক্তোর মত দাঁতের পাঁতি, পদ্মের মত মুখ, আর অঙ্গ ভরে চন্দনের গন্ধ, যেন সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা। পাবে কি তেমন মেয়ে?'

ভাটবামুন কথায় ছত্রিশখানা। তারা বললে—'ঢের ঢের। অমন মেয়ে কটা চাই?'

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'বেশী নয়—একটি শুধু খুঁজে আন।' বলে ভাটদের হাতে তুলে দিল কনে বরণের সুবর্ণের মালা।

এই মালা যার মাথায় জড়িয়ে দেবে—সেই হবে তার পুত্রবধূ। এমনি ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

আটজন ভাট চলে গেল অষ্টদিকে। গেল তো গেল অষ্ট দিন, অষ্ট মাস। খুঁজে খুঁজে হয়রান—কোথায় আছে সেই দেবী-প্রতিমা! ঘুরতে ঘুরতে একদিন আটজনে এসে জড়ো হল শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের নগরী সাকেতে।

সেদিন ছিল সাকেতে মস্ত এক উৎসবের দিন। রাজপথ ভরে চলেছে আনন্দ-উল্লাস। সেদিন কেউ আর ঘরে বন্ধ হয়ে নেই—সবাই বেরিয়ে পড়েছে পথে। মেয়েরা সব স্নান করতে চলেছে নদীতীরের দিকে। ভাটরাও খুঁজে খুঁজে চলল সেদিকে—যদি চোখে পড়ে যায় সেই কন্যে—হাঁটুসমান কেশ যার, মুক্তোর মত দাঁত, পদ্মের মত মুখ আর অঙ্গ ভরে চন্দনের গন্ধ, যেন সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা!

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের মেয়ে বিশাখাও চলেছে নদীতীরের দিকে—সঙ্গে তার পাঁচশ সখী। তারা যেন চাঁদের আলোয় তারার সভা। কেয়ূর-কঙ্কণ-চন্দ্রহারের মণিমুকুতায় জোনাকীর ঝিকিমিকি।

এমন সময় ঝর ঝর করে নামল একখণ্ড উড়ো মেঘের বৃষ্টি। হাত ঝমঝম—পা ঝমঝম, মেয়েরা হুড়মুড় দুড়দুড় করে ছুটল নদীতীরের স্নান-ঘরের দিকে। জলে ভিজতে ভিজতে ছুটল ভাটরাও। গিয়ে আশ্রয় নিলে স্নান-ঘরের বাইরের দালানে।

সবাই ছুটে এল—কিন্তু একটি মেয়ে আর ছোটে না। ধীর-মন্থর পা ফেলে ফেলে স্বাভাবিক চলনে চলেছে তো চলেছেই—যেন রাজহংসী। বসন-ভূষণ ভিজে গেল তার বৃষ্টির জলে। কিন্তু সেদিকে যেন তার খেয়ালই নেই। সে হল ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখা।

আটজন ভাট থমকে চেয়ে রইল বিশাখার দিকে—বুঝি বা এই সে দেবী-প্রতিমা! এতদিনের ছুটোছুটি খোঁজা-খুঁজি বুঝি সার্থক হল! চুল তো নয়, আকাশের মেঘ নেমে এসেছে যেন ওর মাথায়, ওর মুখ দেখে পদ্মও বুঝি লজ্জা পায়। এল সে চন্দনের পরিমল ছড়িয়ে—যেন ঠাকুর ঘরের লক্ষ্মী ঠাকরোনটি। কিন্তু দাঁতগুলো কি মুক্তোর মত? কেমন করে জানা যায়? মেয়েটি কথা কইবে কি হাসবে—তবে তো বুঝতে পারা যাবে! ভাটরা তখন বিশাখাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে নানা মন্তব্য করতে লাগল—যাতে বিশাখা চটে যায়।

একজন বললে, 'মা লক্ষ্মীর সব ভালো—কেবল গতরটাই-যা নড়ে না। যার ঘরে যাবে, তার দিন কাটবে বাসি-আমানি খেয়ে।'

আর একজন মন্তব্য করলে, 'সবাই ছুটে এল—কিন্তু মা লক্ষ্মীর পা যেন আর ওঠে না। বড্ড অলস।'

বিশাখা বুঝতে পারলে—এ সব মন্তব্য তাকেই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বিশাখা চটল না—শান্ত নম্রভাবে ওদের কথার জবার দিল। বললে, 'ছুটতে আমি সবার চেয়ে বেশীই পারি, কিন্তু ছোটাটা সব সময় ভালো না, অন্তত চারজনের বেলায়।'

কথা বলতেই ভাটরা দেখে নিল তার দাঁত। দাঁত তো নয়, মুক্তোর পাঁতি। একজন ভাট বললে, 'কোন্ কোন্ চার জন?'

বিশাখা বললে, 'প্রথম জন—রাজা। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করলে লোকে তাঁকে সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। তাই তাঁর আস্তে আস্তে চলা উচিত। তাতেই তাঁর মহিমা। দ্বিতীয়—রাজার হাতী, তার ধীর গমনে চলাতেই রাজসম্মান। তৃতীয় জন—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। সাধারণ সংসারীর মত তাঁরও ছুটোছুটি করা মানায় না। চতুর্থ হল নারী—ধীর চলাতেই তার সম্মান ও সৌন্দর্য। তা ছাড়াও আমাদের আস্তে চলার অন্য কারণ আছে।'

একজন ভাট আবার শুধোলে, 'কি সে কারণ?'

বিশাখা বললে, 'ছুটোছুটি করতে গিয়ে হাত-পা খোঁড়া হলে চির জীবন আমাদের বাপের বোঝা হয়ে কাটাতে হয়। খোঁড়া নুলো মেয়ের ভার আর কেউ নেয় না।'

তার কথা শুনে ভাটরা মুগ্ধ। একজন ভাট মিগার শ্রেষ্ঠীর দেওয়া সেই স্বুবর্ণের মালাটি বিশাখার মাথায় জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তোমায় আজ পূর্ণবর্ধনের বধূরূপে বরণ করে নিলাম।'

এই বরণের খবর চলে গেল ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কাছে। তারপর ভাটের মুখে মিগার শ্রেষ্ঠীর ছেলে পূর্ণবর্ধনের খোঁজ-খবর পেয়ে ধনঞ্জয় খুশীই হল—রাজি হল তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। তারপর ভাটরা ছুটল শ্রেষ্ঠী মিগারের কাছে।

মিগার শ্রেষ্ঠীও মেয়ের বিবরণ পেয়ে খুশী। ঠিক করে ফেললেন

যাত্রার শুভদিন—শুভলগ্ন। তারপর একদিন সেজে দাঁড়াল বিয়ের বরযাত্রী।

রাজা প্রসেনজিৎ বললেন, 'শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের মেয়ের বিয়ে? তবে আমিও যাব সঙ্গে।' বলে সেজে বেরোলেন তিনিও। সঙ্গে চলল তাঁর হয়-হস্তী সেনাবাহিনী।

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের ধন দৌলতের অন্ত নেই। লোকবলের সীমা নেই। যত বরযাত্রীই আসুক, তার ভয়-ডর নেই। বিশাখাও তেমনি বুদ্ধিমতী। ধনঞ্জয় বরযাত্রীদের সব ভার তুলে দিলেন বিশাখার হাতে। বিশাখা নিপুণভাবে ব্যবস্থা করলে—কোথায় থাকবেন রাজা, কোথায় থাকবেন মিগার শ্রেষ্ঠী, কোথায় থাকবে বা হয়-হস্তী-সেনাবাহিনী, কে করবে বা তাদের তদারক।

এদিকে ধনঞ্জয় ডাক দিল পাঁচশ' কর্মকারকে—মস্ত লম্বা ফর্দ দিল মেয়ের অলঙ্কারের। দিল হীরা জহরৎ মণি মানিকের কাঁড়ি। সাকেত জুড়ে শব্দ উঠল ঠুক-ঠাক ঠুক-ঠাক। দিনে কামাই নেই—রাতে ঘুম নেই। গড়া হতে লাগল নানা ছাঁদের অলঙ্কার। এমনি করে দিনের পর দিন কাটে—কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার নাম গন্ধও নেই।

রাজা ভাবলেন, সামান্য এক শ্রেষ্ঠীর ওপরে এ বড় অত্যাচার হচ্ছে। তাই একদিন তিনি ধনঞ্জয়কে লিখে পাঠালেন, 'আর কতদিন এতগুলো লোকের ঝামেলা পোয়াবেন, এবার মেয়ে পাঠাবার দিন ঠিক করুন।'

ধনঞ্জয় বলে পাঠাল, 'ঝামেলার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নই। চারমাস এখান থেকে আর নড়তে পারবেন না—কারণ, এবার বর্ষা নামছে।'

সাকেতের বর্ষায় পথঘাট সুদুর্গম। কাক-পক্ষীটিরও ওড়া বন্ধ। অতএব রাজা আর তাঁর রাজবাহিনী রইলেন আটকা পড়ে। আর সাকেত জুড়ে চলল প্রতিদিনের উৎসব। মালাকার যোগায় হাজার হাজার মালা, সুগন্ধি সুরভি নিয়ে ছুটোছুটি করে হাজার হাজার পরিচারিকা, সকলের অঙ্গে অঙ্গে নিত্যি নতুন পোশাকের রঙিন আশনাই, সেবক-ভৃত্যদের হাতে হাতে যায় প্রতিদিন নানা রকমের উপহার। শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কোন অভাব নেই—কারণ ঘরে তার বিশাখারূপিণী লক্ষ্মী।

এমনি করে কেটে গেল চারটি মাস—শেষ হল সাকেতের ভয়ঙ্কর বর্ষাকাল। তারপর শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় একদিন ঠিক করল মেয়ে পাঠাবার শুভদিন শুভলগ্ন।

যাওয়ার আগের দিন ধনঞ্জয় উপদেশ দিতে বসল মেয়েকে। বললে, 'শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দশটি কাজ কোনও দিন ভুলিসনে বিশাখা! ঘরের আগুন বাইরে নিবিনে; বাইরের আগুন ঘরে আনবিনে; তাকে দিবি—যে দেয়; যে দেয় না—তাকে দিবিনে; তবু বিশেষ জনকে দিবি—তারা ফিরে দিক আর না দিক; সুখে বসবি, সুখে খাবি; সুখে ঘুমোবি; ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ভুলিস নে; মান্য করে চলিস গৃহ-দেবতাদের।'

পাশের ঘরে বসে বসে শুনছিল মিগার শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয়ের উপদেশ শুনে ভাবলে, 'এ আবার কি ছাইয়ের উপদেশ। যাই হোক, ভালোয় ভালোয় এখন মেয়েটিকে নিয়ে শ্রাবস্তীতে গিয়ে পড়তে পারলে হয়।'

তারপর ওদিকে ধনঞ্জয় সাকেতের শিল্পকর্মীদের জমায়েত করে বলল, 'তোমাদের ভিতর থেকে বেছে দাও আটজন মাতব্বর গেরস্ত লোক—যারা আমার মেয়ের সঙ্গে যাবে, মেয়ের কাছে থাকবে। মেয়ে যদি আমার কখনও অপরাধ করে—তারাই তার বিচার করে দেবে।'

শিল্পকর্মীরা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করে দিল।

মেয়ের মা বললে, 'সবই হল—কিন্তু দাস-দাসী তো পাঠালে না। আমার মেয়ের ফাই-ফরমাশ খাটবে কে?'

ধনঞ্জয় বললে, 'সে আমি কারুকে জোর করে পাঠাব না। চোদ্দ-খানা গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাব ডাক দিয়ে দিয়ে—যার ইচ্ছে হবে সে-ই যাবে।'

কিন্তু যেমন বলা—'কে যাবে আমার মেয়ের সঙ্গে'—অমনি গাঁ ভেঙে পিলপিল করে চলল যে কত লোক, তার ঠিক ঠিকানা নেই। বিশাখা যে সবার প্রিয়।

কিন্তু মিগার শ্রেষ্ঠীর চক্ষু চড়ক গাছ। সে শুধোলে, 'এরা কারা?'

একজন বলল, 'তোমার পুত্রবধূর যারা ফাই-ফরমাশ খাটবে—তারা।'

'হায় সর্বনাশ ! অত লোককে খেতে দেব কোথা থেকে ! তাড়াও—তাড়াও, মেরে তাড়াও।'

মিগার শ্রেষ্ঠীর হুকুম পেয়ে তার লোকজন মহা উৎসাহে লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাদের তাড়া করল, ছুঁড়তে লাগল বড় বড় পাথরের চাঁই।

বিশাখা বললে, 'এ কি।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'ভেবো না মা লক্ষ্মী ! এই লাঠি-কোঁৎকা খেয়ে যে পালাবার সে পালাবে—যে যাওয়ার সে ঠিক যাবে।'

এই ভাবে বিশাখার অনুরক্ত দাসদাসী বাছাই হয়ে চলল বিশাখার সঙ্গে সঙ্গে। তাও অনেক। মিগার শ্রেষ্ঠী 'হায় হায়' করতে লাগল, 'এও যে কম নয়। খেতে দেব কোত্থেকে !'

এমনি বিরাট মিছিল আর নানা বাজনা-বাদ্যি করে বধূ বিশাখা এল শ্বশুরবাড়ি। গোটা শ্রাবস্তীর লোক দেখতে লাগল অবাক বিস্ময়ে। মানুষ-জন, হয়-হস্তী আর গোরুর এমন মিছিল, এত মণিমানিকের যৌতুক কখনও তারা দেখেনি, কখনও দেখেনি এমন অপরূপ রূপবতী কন্যা, যেন সত্যিই স্বর্গের দেবী-প্রতিমা।

এবার শুরু হল বিশাখার বধূ-জীবন। বাপের উপদেশ তার মনে গাঁথা আছে—আর গাঁথা আছে কবে সেই একবার সাত বছর বয়সে শোনা স্বয়ং বুদ্ধদেবের বাণী। প্রতিদিন মনে মনে জানায় সে তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রণাম। কিন্তু শ্বশুর তার জৈন সন্ন্যাসীর ভারি ভক্ত। একদিন সে একদল জৈন সন্ন্যাসীকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনল। তাদের খাওয়াল-দাওয়াল—আদর আপ্যায়ন করল। তারপর তাদের সব বিদেয় করে দিয়ে নিজে খেতে বসল বহুমূল্য আসনে। সোনার থালায় পায়েস পরমান্ন পরিবেশন করল বিশাখা।

এমন সময় দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বিশাখার সাধ হল—ওই সন্ন্যাসীকেও ডেকে খেতে দেয়। কিন্তু শ্বশুর আদেশ না করলে হয় না। তাই শ্বশুর যাতে সন্ন্যাসীকে দেখতে পান—এমন ভাবে বিশাখা সন্ন্যাসীর দিকে উঠে গেল। শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী চোখ তুলে একবার দেখল—তারপর হাঁ-ও করল না, হুঁ-ও করল না। যেমন খাচ্ছিল—তেমনি খেতে লাগল গপগপ করে।

ব্যাপারটা বিশাখার মনে বড় লাগল। সন্ন্যাসীকে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিছু হবে না—আপনি যান। উনি বাসি খাবার খাচ্ছেন।'

সন্ন্যাসী বিদায় হল। তখন শ্বশুর উঠল চটে। বললে, 'কী, আমি সোনার থালায় খাচ্ছি পরমান্ন--আর তুমি কি না ওই সন্ন্যাসীটাকে বললে, বাসি খাবার! আমি খাচ্ছি বাসি খাবার?'

আর খাওয়া হল না মিগার শ্রেষ্ঠীর—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। তার-পর হুকুম দিল নিজের লোকজনকে, 'ওই বৌকে এক্ষুনি বিদেয় কর।'

বিশাখা নম্র ভাবে বলল, বাবা আমার সঙ্গে পঞ্চায়েৎ পাঠিয়েছেন—তাঁরাই সব শুনে বিচার করে দিন।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'ডাক পঞ্চায়েৎ।'

সেই আটজনের পঞ্চায়েৎ এসে বসল ঘরে। মিগার শ্রেষ্ঠী পেশ করল বিশাখার অপরাধ। সোনার থালার পরমান্নকে নোংরা বাসি খাবার বলে অপমান করা কি যে-সে অপরাধ! মিগার শ্রেষ্ঠী রাগে ফুঁসতে লাগল।

পঞ্চায়েৎ শুধাল বিশাখাকে, 'একি সত্যি?'

বিশাখা বললে, 'দুয়োরে দাঁড়ান অতিথিকে না দিয়ে যে খাবার খাওয়া হয়—সে খাবার বাসি খাবারেরই মত। উনি যখন খাচ্ছিলেন তখন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন, উনি দেখেও দেখলেন না।'

পঞ্চায়েৎ বলল, 'তবে তো আমাদের মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে।'

মিগার শ্রেষ্ঠী চটে বলল, 'তা না হয় হল, তবু ও ডাইনী। একদিন দেখেছি, মশাল জ্বেলে কয়েকজন সখীর সঙ্গে রাত্রে কোথায় বেরিয়ে গেল।'

পঞ্চায়েৎ বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলে, 'এ কথা কি সত্যি?'

'না।' বিশাখা বলল, সেদিন একটা তেজী ঘোড়ার বাচ্চা হল। তার পরিচর্যার জন্য দেখলাম কেউ গেল না। ভালো জাতের ঘোড়ার পরিচর্যা দরকার—তাই আমি গিয়েছিলাম।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে ত আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

মিগার শ্রেষ্ঠী রাগে টগবগ করতে করতে বলল, 'তা না হয় হল।

কিন্তু ওর বাবা ওকে কী সব উদ্ভট উপদেশ দিয়েছিল আসবার সময়—তার মানে কি? সে সব কী সৎ গেরস্তের কথা? ছি ছি!'

পঞ্চায়েৎ শুধাল, 'কি বলেছিল?'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'ঘরের আগুন বাইরে নেবে না। তা পড়শীর ঘরে আগুন যদি না থাকে—তাকে একটু আগুন দেবে না?'

বিশাখা বলল, 'আমার বাবা ওই অর্থে ওই কথা বলেন নি। ও কথার মানে হল—শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীর কোনও দোষ দেখলে তা বাইরে বলবে না, তা ঘরে আগুন লাগানোর চেয়েও খারাপ।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে তো আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু ওর বাবা বলেছিল—বাইরের আগুন ঘরে নেবে না। তা আমাদের ঘরে যদি কখনও আগুন নিভে যায়, তা হলে পড়শীর ঘর থেকে এক-আধটুক আগুন না আনলে চলবে?'

বিশাখা বললে, 'এর মানে ওই নয়। ওর মানে হল—পাড়ায় যদি কেউ শ্বশুর-শাশুড়ীর বা স্বামীর সম্পর্কে কু-কথা বলে, তা হলে তা কখনও ঘরে এসে বলবে না।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে তো আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

কিন্তু বোকা মিগার শ্রেষ্ঠী কি তবু থামে! ধনঞ্জয়ের উপদেশগুলোর আসল মানে সে বোঝেইনি। বার বার তাই সে জিজ্ঞেস করে—আর বিশাখা তার উত্তর দেয়। সব কথার পর মিগার শ্রেষ্ঠী বুঝল—যে ধার নিয়ে শোধ দেয় না তাকে আর ধার দিতে নেই; কিন্তু আত্মীয় কুটুম বন্ধু—তারা দিতে পারুক আর না পারুক, তাদের দিয়ে-থুয়ে খেতে হয়; শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে বসে থাকতে নেই—উঠে দাঁড়াতে হয়; শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাইয়ে-দাইয়ে তবে নিজে খাবে; তাঁদের সামনে কখনও শুয়ে থাকবে না; তাঁদের মান্য করবে স্বয়ং অগ্নির মত; তাঁরাই তোমার ইহ-জীবনের গৃহদেবতা। এসব কথার মানে বুঝে মিগার শ্রেষ্ঠী লজ্জায় মাথা হেঁট। দশ কথায় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মেয়েকে দিয়ে দিয়েছে সেকালের বধূ-জীবনের সব উপদেশ।

এই বিশাখাকে মিগার শ্রেষ্ঠী কি-না তাড়িয়ে দিতে চাইছিল।

বিশাখা তাই অভিমানে এবার বলল, 'যাক, আপনি তো আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইছিলেন—তা এবার আমি বাপের বাড়ি যেতে চাই।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'না বুঝে আমার দোষ হয়েছে মা—তুমি যেয়ো না।'

বিশাখা বলল, 'থাকতে পারি—যদি একটা অনুমতি দেন।'

'বল কি অনুমতি? তোমাকে আমি সব দেব।'

বিশাখা বলল, 'আমার বাবা বুদ্ধভক্ত, আমিও তাঁর উপাসিকা। যদি এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করেন—তা হলে থাকতে পারি।'

'কর তোমার যা খুশি'—বলে মিগার শ্রেষ্ঠী তো অনুমতি দিল। কিন্তু তার জৈন সন্ন্যাসীরা তাকে চেপে ধরল, 'খবরদার, ওদের ডেক না।'

কিন্তু বিশাখা ওদিকে স্বয়ং তথাগতকে তাঁর দলবল-সহ একদিন নেমতন্ন করে বসল। তারপর বুদ্ধদেব যখন এসে পড়লেন তখন সে শ্বশুরকে খবর পাঠাল—'আপনিও আসুন।'

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জৈন সন্ন্যাসীরা গিয়ে আবার চেপে ধরল মিগার শ্রেষ্ঠীকে, 'খবরদার যেয়ো না ওই গৌতম মুনির কাছে।'

মিগার শ্রেষ্ঠী দো-টানার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশাখা এসে বলল, 'অন্তত তাঁর উপদেশগুলো শুনুন।'

মিগার শ্রেষ্ঠীর যাওয়ার ইচ্ছা—দেখাই যাক না, বুদ্ধদেব কি উপদেশ দেন। কিন্তু জৈন সন্ন্যাসীরা হুঁশিয়ার করে দিয়ে আবার বলল, 'যাও—কিন্তু নিজে তুমি পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। ওর সামনা-সামনি পড়লে তুমি জাদু হয়ে যাবে।'

কিন্তু হায়, যাঁর বাণী রাজার পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে, সমুদ্র পর্বত পার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, তাঁকে কি রুখতে পারে ওই সামান্য পর্দার অন্তরাল! উপদেশ শুনতে শুনতে মিগার শ্রেষ্ঠী ছুটে এল একদিন পর্দা ছিঁড়ে। এসে লুটিয়ে পড়ল তথাগতের চরণে। দেখতে দেখতে গোটা পরিবারটি হয়ে উঠল তথাগতের ভক্ত। জৈন সন্ন্যাসীরা বিরক্ত হয়ে মিগার শ্রেষ্ঠীকে ছেড়ে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বধূ বিশাখার গুণের কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল গোটা শ্রাবস্তী। যেমন তার গৃহধর্ম—তেমনি তার ধর্ম আচরণ। ঘরের কাজ পাট সেরে করে অন্ধ-আতুরের সেবা, অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যা। তারপর জেতবনে যায় বুদ্ধের উপদেশ শুনতে। দেখতে দেখতে শ্রাবস্তীর গোটা নারী-সমাজ তাকে আদর্শ বলে মেনে নিল। সেবার পরিচর্যায় তারা অনুকরণ করে বিশাখাকে, তার পেছনে পেছনে যায় জেতবন পর্যন্ত—শোনে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী।

এমনি যেতে-আসতে বিশাখা একদিন জেতবনে গিয়ে ভুলে ফেলে এল একখানা অলঙ্কার। আনন্দ সেটি তুলে রাখলেন বিশাখাকে দেবেন বলে। বুঝলেন—এ বহুমূল্য অলঙ্কার বিশাখার ছাড়া আর কারুর নয়। কিন্তু মহাভিক্ষু আনন্দ যা হাত দিয়ে ছুঁয়েছেন তা আর বিশাখা ফেরত নেবে কি করে ? অথচ অলঙ্কারখানা পড়ে থাকলেও তো কোনও কাজে লাগবে না ভিক্ষুদের। বিশাখা তখন সেটি নিয়ে বেচতে পাঠাল। কিন্তু শ্রাবস্তীতে তার খদ্দের পাওয়া গেল না—কে কিনবে অত মূল্যের অলঙ্কার ! তখন বিশাখাই সেটি কিনে নিল কোটি কোটি টাকা দিয়ে। তারপর তথাগতকে গিয়ে বলল, 'কি করব এই টাকা দিয়ে—আদেশ করুন।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'শ্রাবস্তীর পূর্বদিকে ভিক্ষুদের জন্য একটা বিহার তৈরি কর।'

বধূ বিশাখার মনে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই সে শুনতে পেল—সশিষ্য বুদ্ধদেব কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। বিশাখা ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। অভিমানভরে বলল, 'আমার যে বিহার তৈরি পড়ে রইল প্রভু !'

বুদ্ধদেব প্রশান্ত হেসে বললেন, 'যার ওপরে তোমার কাজের ভার দিতে চাও মা—তার ভিক্ষাপাত্র চেপে ধর !'

বিশাখা দেখল, মোগ্‌গলায়নের মত করিৎকর্মা, আর কেউ নেই, ছুটে গিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র চেপে ধরল।

বুদ্ধদেব তখন তাঁকে বললেন, 'পাঁচশ ভিক্ষু নিয়ে ফিরে যাও মোগ্‌গলায়ন, বিশাখার বিহার তৈরি করে দাও।'

মোগ্গলায়ন ফিরে এলেন, তাঁর অমিত কর্মদক্ষতা আর পাঁচশ ভিক্ষুর লোকবল নিয়ে লেগে গেলেন বিহার তৈরি করতে। ন'মাস পরে স্বয়ং তথাগত যখন শ্রাবস্তীতে আবার ফিরে এলেন—তখন দেখলেন, আকাশ ছুঁয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিশাখার পূর্ব বিহার। বুদ্ধদেব বিশাখাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার আদর্শ, তোমার কীর্তি দিকে দিকে প্রচারিত হোক।'

সেদিন বধূ বিশাখার আনন্দ আর ধরে না। আকাশ থেকে যখন নেমে এল সন্ধ্যার শান্ত ছায়া, জুঁইবনে ফুটল ফুলের রাশি, তখন বধূ বিশাখা তার ছেলেপুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেই গগনস্পর্শী বিহারের তলায়। বিহার প্রদক্ষিণ করে গান গাইতে লাগল মনের আনন্দে—গান তো নয়, যেন জীবন-জোড়া বন্দনা। কবে দেখেছিল যেন এমন স্বপ্ন—কবে জন্মেছিল যেন এমন সাধ, এমনি একটি বিহার গড়ে দেবে সে। অন্ন দেবে, বস্ত্র দেবে, সেবা দেবে—সাধ্য দেবে উজাড় করে। প্রার্থনা আজ তার সার্থক হয়েছে—স্বপ্ন-সাধ হয়েছে সফল। মনের আনন্দে গান গেয়ে বিশাখা বিহার প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

ভিক্ষুরা ভাবল, বধূ বিশাখার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! তারা ছুটল তথাগতের কাছে। গিয়ে বললে, 'প্রভু, বিশাখার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? তাকে গান গাইতে তো কখনও শুনিনি! আজ সে ছেলেপুলে নিয়ে বিহারের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে।'

বুদ্ধদেব প্রশান্ত হেসে বললেন, 'মাথা খারাপ হবে কেন, আমার মেয়ের জন্মজন্মান্তরের প্রার্থনা আজ সফল হয়েছে। তাকাও ওর জীবনের দিকে—তাকাও ওর কীর্তির দিকে।' বুদ্ধদেব কয়েক চরণ কবিতা আবৃত্তি করে বললেন, 'সুন্দর ফুলের রাশি দিয়ে মালাকার যেমন করে মালা গাঁথে—তেমনি পুণ্য কর্মের ফুলগুলি দিয়ে গেঁথে তোল তোমাদের জীবন।'

....

বধূ বিশাখা
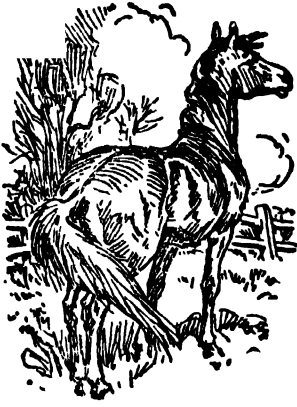
বন্দী ঘোড়া

প্রাচীন জৈনকথা থেকে

অনেক কাল আগে এক রাজ্য ছিল—তার নাম হস্তিশীর্ষ। তার রাজার নাম ছিল কনককেতু। যেমন রাজার নাম, তেমনি তার রাজ্যও ছিল কনকবরণ—চারিদিকে কনকের ছড়াছড়ি। রাজ্য জুড়ে ছিল বড় বড় সওদাগর—তারা হাজার দাঁড়ের জাহাজে পাল তুলে দিয়ে চলে যেত সাত সমুদ্র-পার। কোথায় কোন্ দ্বীপে আছে সোনার খনি রুপোর খনি, কোথায় আছে মণি-মানিকের খনি—সেখান থেকে জাহাজ বোঝাই করে আনত সোনা-রুপা মণি-মানিকে। সারা রাজ্য ঝলমল করত তাদের ঐশ্বর্যে।

একবার সমস্ত সওদাগর একসঙ্গে মিলে রওনা হল সমুদ্রে। বড় বড় জাহাজ দাঁড়াল সার দিয়ে—তার আশেপাশে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে সাজান হল মস্ত এক বহর। জলে পড়ল হাজার হাজার দাঁড়ি। বাজল কত বাদ্যি বাজনা বাঁশি। ঘরে ঘরে উঠল শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি। কি—না, হস্তিশীর্ষের সওদাগররা চলল বাণিজ্যে। জাহাজ বোঝাই কত গজদন্তের কারুকাজ, দশার্ণ দেশের বিখ্যাত তরোয়াল, কত রেশম পশম মিহিন সুতোর কাপড়। জাহাজের বিরাট বহর ভেসে চলল একদিন—দুদিন—তিনদিন।

তারপর হঠাৎ একদিন সমুদ্রে উঠল ভীষণ ঝড়। জাহাজে পড়ে

গেল 'সামাল সামাল' রব। কিন্তু সামলাবে কে! মাঝিরা হিমসিম খেয়ে গেল—দাঁড়িরা ঘামে ভিজে নেয়ে উঠল। জাহাজগুলো ভেসে চলল ঝড়ের মুখে; কোথায়—কে জানে! দাঁড়ি-মাঝি সওদাগর আর তাদের লোকলস্কর সবাই মিলে ডাকতে লাগল তেত্রিশ কোটি দেবতাকে, যত যক্ষ রক্ষ ভূতকে। কিন্তু ঝড় তবু থামে না। সমুদ্রে উঠছে বিরাট বিরাট ঢেউ। জাহাজগুলো এই ডোবে তো ওই ডোবে। ঝড়ের মুখে সেগুলো এক দিকে ভেসে চলল তো চললই। চারিদিক মেঘে মেঘে অন্ধকার। কোনও দিকে কুলের নিশানা নেই। এদিকে ছিঁড়ে গেছে জাহাজের পাল, ভেঙ্গে গেছে দাঁড় আর হাল।

সওদাগরদের কপাল ভালো। কিছুক্ষণ বাদেই ঝড় থেমে গেল। দাঁড়ি-মাঝিরা চারিদিকে চোখ মেলে দেখতে লাগল ঝড়ের মুখে কোথায় ভেসে এসেছে তারা। হঠাৎ একদিকে দেখা গেল ঝিলমিল করছে তীরের গাছপালা!

নৌবহরের মিয়ামক সবজান্তা লোক। চারিদিক ভালো করে দেখে বলল, 'আমরা বোধ হয় কালিকা দ্বীপে এসে পড়েছি।'

জাহাজে জাহাজে উঠল আনন্দের লহর। জলে পড়ল আবার হাজার হাজার দাঁড়। সবাই বললে, 'চল তবে দ্বীপে।'

নৌবহরের নিয়ামক বলল, 'উঁহু জাঁহাজ তো ভিড়বে না তীরের কাছে। এখানে জল কম, জাহাজ চড়ায় বসে যাবে।'

'তবে!'

নিয়ামক বললে, 'জাহাজের সঙ্গে যে সব ছোট নৌকো বাঁধা আছে সেগুলো নিয়ে চল, তীরে গিয়ে উঠি।'

তখন ছোট ছোট নৌকো ভাসিয়ে চলল সওদাগরেরা। সঙ্গে চলল তাদের হাজার হাজার লোকলস্কর।

দ্বীপে নেমেই তারা অবাক। দেখতে পেলো—বুনো ঘোড়ার পাল চরছে সমুদ্রের ধারে। যেমনি মানুষ-জন দেখা—অমনি চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ছুটে পালাল গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

সওদাগররা আফসোস করতে লাগল, 'আহা, এমন সুন্দর সুন্দর তেজী ঘোড়াগুলোর একটাও ধরা গেল না!'

তারা ঘোড়া ধরতে পারল না বটে কিন্তু পেয়ে গেল সোনার খনির সন্ধান, রুপোর খনির সন্ধান—আরও কত মণি-মানিকের খনি। জাহাজ বোঝাই করল তারা সেই সোনা রুপো মণিমানিকে। তারপর একদিন আবার ছেঁড়া পাল তুলে, ভাঙা হাল ধরে ফিরে চলল দেশের দিকে।

সওদাগরদের নৌবহর যেদিন দেশের বন্দরে এসে ভিড়ল সেদিন সাড়া পড়ে গেল রাজ্য জুড়ে। সওদাগরেরা ফিরে এসেছে কত অগাধ ধনদৌলত নিয়ে। দেখতে ছুটে এল সবাই। ধনদৌলতে সার সার-গোরুর গাড়ি বোঝাই করে সওদাগরেরা তখন ফিরে চলেছে ঘরে।

তারপর সওদাগরেরা একদিন একসঙ্গে মিলে অনেক ধনদৌলত নিয়ে রাজা কনককেতুকে উপহার দিতে চলল।

উপহার পেয়ে রাজা খুব খুশী।

রাজা বললেন, 'কত দেশ-দেশান্তর তোমরা ঘুরে এলে—কোথায় কি নতুন জিনিস দেখলে তার কথা বল।'

একজন সওদাগর বলল, 'কালিকা দ্বীপে গিয়ে আমরা জঙ্গলের ঘোড়া দেখেছি—যেমন তেজী, তেমনি সুন্দর।'

রাজা বললেন, 'তবে ধরে আন সেই ঘোড়া।'

সওদাগরেরা বলল, 'সে যে জঙ্গলের ঘোড়া মহারাজ—ধরা বড় শক্ত।'

রাজা বললেন, 'যেমন করে' পার—ধরে আন সেই ঘোড়া। যত লোকলস্কর তোমাদের দরকার—নিয়ে যাও সঙ্গে করে। নিয়ে যাও আমার ঘোড়া বশ-করা ওস্তাদ সহিসদের! আমার ঘোড়া চাই।'

উপায় নেই, রাজার আদেশ। সওদাগরদের নৌবহর সেজে দাঁড়াল আবার বন্দরের ঘাটে। সওদাগরেরা জাহাজে উঠল। সঙ্গে চলল এবার রাজার সৈন্যসামন্ত—ঘোড়া বশ-করা ওস্তাদ সহিসের দল। সঙ্গে নিল ঘোড়ার যত রকমের প্রিয় খাদ্য আছে—যা একবার চোখে দেখলে ঘোড়ার জিভে জল না এসে পারবে না, যার গন্ধ একবার নাকে গেলে তারা না খেয়ে আর পারবে না। আর নিল বেণু বীণা মৃদঙ্গ ঢোল—যে বাজনা শুনে ঘোড়া নেচে ওঠে। নিল এমন সব সহিস যাদের হাতে ডলাই-মলাই খেলে ঘোড়া যত বুনোই হোক—আরামে

চোখ না বুজে পারবে না, বশ তারা হবেই হবে। এইসব নিয়ে সওদাগরেরা একদিন আবার কালিকা দ্বীপে গিয়ে হাজির হল।

প্রথমে তাদের দেখেই ঘোড়াগুলো চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ছুটে পালাল আবার জঙ্গলের দিকে। সওদাগরেরা তখন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঘোড়ার প্রিয় খাবারগুলো সাজিয়ে রাখল এক জায়গায়। ঘোড়া বশ-করা সহিসের দল লুকিয়ে রইল গাছপালার আড়ালে। আর কিছু লোক বেণু বীণা মৃদঙ্গ ঢোল বাজাতে শুরু করে দিলে ছন্দে তালে।

সেই তালে তালে নেচে উঠল বনের যত ঘোড়া।

তাদের নাচন দেখে বুড়ো বুড়ো ঘোড়ারা হুঁশিয়ার করে দিয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বললে, 'কি, কি—অত নাচিস কেন?'

একটি ঘোড়া বলল, 'শুনছ না কেমন নাচের বাজনা!'

বুড়ো ঘোড়ারা মুখ গোমড়া করে বলল, 'খবরদার! জ্ঞানীরা বলে গেছেন—মধুর বা কর্কশ, শব্দ যেমনই হোক তাতে ভুলবে না।'

'তবে তোমরা থাক,' বলে একটি ছোকরা ঘোড়া নাচতে নাচতে দল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

তারপর বন থেকে যেই বেরোনো অমনি দেখতে পেল ভালো ভালো খাবার—শুধু তাই নয়, কেমন তার খুশবই! শুধু কি খুশবই!—কেমন তার আবার আস্বাদ।

আগে ভাগে এসে এমন সব সুস্বাদু খাবার পেয়ে সে গপগপ করে খেতে লাগল।

বনের ভেতর থেকে অন্য ঘোড়ারা বললে, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ—কি—কি—কি?'

লোভী ঘোড়াটা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে আনন্দে ডাক দিল সবাইকে, 'হিঁ-হিঁ—খাবে তো ছুটে এস। দেখছ না—কেমন সব সুন্দর সুন্দর খাবার।'

দেখেই তো সকলের খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দলের বুড়ো বুড়ো ঘোড়ারা সকলকে আবার সাবধান করে দিয়ে বলল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন, যে কোনও জিনিস সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক, তাকে লোভও করবে না, ঘেন্নাও করবে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

অন্য ঘোড়ারা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল।

ওদিক থেকে লোভী ঘোড়াটা খেতে খেতে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে আবার বলে উঠল, 'কি, কি—দেখছ কি? কেমন খুশবই—নাকে কি গন্ধও পাচ্ছ না?'

বুড়ো ঘোড়ারা বলল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন—যে কোনও জিনিস সুগন্ধ হোক কি দুর্গন্ধ হোক—তার দিকে তাকাবে না, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

অন্য ঘোড়ারা বুড়োদের কথা ঠেলতে না পেরে চেয়ে রইল লোভী ঘোড়াটার দিকে আর জিভ দিয়ে তাদের জল পড়তে লাগল।

লোভী ঘোড়াটা গপগপ করে খেতে খেতে চিঁ-হিঁ-হি করে বলে উঠল আবার, 'ছি ছি—চলে এস। খাবারগুলোর কি স্বাদ!'

বুড়ো ঘোড়ারা বলে উঠল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন—স্বাদ ভাল হোক আর মন্দ হোক—কোন জিনিসে লোভ করবে না, বিরক্তও হবে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

এত বলেও শেষ পর্যন্ত সব ঘোড়াকে তারা আটকাতে পারল না। বেশ একটা বড় দল বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে ছুটে এল লোভী ঘোড়াটার কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই খাবারের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার যত লোকলস্কর আর ওস্তাদ সহিসের দল ছুটে এসে ঘিরে ফেলল ঘোড়াগুলোকে। মোটা মোটা দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে সব কটাকে বেঁধে ফেললে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে তুলল জাহাজে।

সেই দিনই তারা জাহাজ ভাসিয়ে স্বদেশের দিকে রওনা দিল। দেশে ফিরে ওই ঘোড়ার পাল নিয়ে সওদাগররা সোজা গিয়ে হাজির হল রাজার কাছে।

ঘোড়া দেখে রাজার আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। সওদাগরদের ওপর খুশী হয়ে রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন, সওদাগরদের কাছ থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আর রাজকর আদায় করা হবে না। তাছাড়াও তাদের পুরস্কার দিলেন অনেক ধনরত্ন। আর ঘোড়াগুলোকে পাঠিয়ে দিলেন ঘোড়াশালে।

তারপর রাজার হাজার হাজার ঘোড়া তালিম-দেওয়া ওস্তাদ সহিসেরা লেগে গেল ঘোড়া তালিম দিতে। প্রথম দিকে ঘোড়াগুলো চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠল। যত হোক, বনের জংলি ঘোড়া— সহজে পোষ মানবে কেন! কিন্তু সহিসদের চাবুকের ঘা খেয়ে তারা ঢিট হয়ে গেল একে একে। ঘোড়াশালে বন্দী হয়ে আফসোস করতে লাগল সবাই, 'হায়—কেন বুড়োদের হুঁশিয়ারী শুনলাম না—কেন জ্ঞানীদের কথায় কান দিলাম না। কোথায় পড়ে রইল সেই স্বদেশের অবাধ বনভূমি আর সমুদ্রের তীর!'

ঘোড়াগুলো একসঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদতে লাগল চিঁ-হিঁ-হিঁ করে।

....

অজ্ঞাতবাস

ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' থেকে

অরণ্য-পথ দিয়ে আগে আগে চলেছেন বৎসরাজ-মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আর পেছনে রানী বাসবদত্তা। মন্ত্রীর বেশবাস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মত—আর রানী বাসবদত্তা যেন অবন্তির সামান্য ঘরন্তী মেয়ে। অঙ্গে নেই রত্নভূষিত রাজরানীর বেশ। শুকিয়ে গেছে অবন্তির মেয়ের ফুলের কেয়ুর, ফুলের বালা, ফুলের মালাগাছি। শুধু তাঁর কুঁচবরণ অঙ্গে ময়ুরকণ্ঠি শাড়ি আর ডাগর ডাগর উজ্জ্বল দুটি চোখ মনে করিয়ে দেয়— তিনি অবন্তিদেশবাসিনী। দীর্ঘ পথ হেঁটে আসার পরিশ্রমে দুজনেই শ্রান্ত ক্লান্ত। শান্ত বনভূমির ছায়ায় এসে একটু যেন আরামে হেঁটে হেঁটে চলেছেন।

এখানে নেই নগর-জনপদের হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি—নেই কোনও হানাহানির কোলাহল ; আর জুলুম নেই—জালিয়াতি নেই, নেই রাজ্যপাটের হলাহল। আছে শুধু শান্ত সমাহিত অরণ্যের ধ্যান— ধ্যানে বসে আছে বড় বড় জট মেলে দিয়ে বনস্পতিরা—ধ্যানে বসেছে ফুল লতা ছায়া। অদূরে উঁকি মারছে তপোবন আশ্রম। যত পবিত্রতা, যত শান্তি—সব যেন ওইখানে। সেই দিকে চেয়ে পথের সব শ্রান্তি সব ক্লান্তি জুড়িয়ে যায় চোখের পলকে। ভয়-ভোলা হরিণ শিশুর দল ছুটে বেড়াতে বেড়াতে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে নতুন মানুষ দেখে, পলক পড়ে না আশ্রমের কপিলা গাভীর কাজল কালো চোখে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় ঘৃতাহুতির গন্ধ, এখান ওখান থেকে উঠছে যজ্ঞের ধোঁয়া —আর দূর থেকে ভেসে ভেসে আসে মুনিকুমার কণ্ঠের সামগান। তার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন মন্ত্রী আর রানী বাসবদত্তা।

এমন সময় আশ্রম বনভূমির সব শান্তি সব স্নিগ্ধতা খান খান করে হাঁক উঠল যেন চৌকিদারী হাঁক, তফাৎ যাও—তফাৎ যাও। আরে হেই-হেই, তফাৎ—'

রানী আর মন্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন, 'হায়, এখানেও দেখি তাড়ন-পীড়ন আছে। এ হেন তপোবন আশ্রম।'

বাসবদত্তা ব্যথিত হয়ে বললেন, 'কে কাকে এমন করে তাড়াচ্ছে?'

মন্ত্রী জবাব দিলেন, 'মহারানী, যার গায়ের জোর বেশী।'

বাসবদত্তা বললেন, 'আমাকেও হয়তো একদিন এমনি বিতাড়িত হতে হবে। এই তাড়া খাওয়ার চেয়ে বড় অপমান আর কিছু নেই।'

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মুখে কঠিন কথা আটকায় না। তিনি বললেন, 'মহারানী ছিলেন যখন তখন এই তাড়না করার আনন্দ আপনিও পেয়েছেন। আজ অবিশ্যি সব ছেড়ে চলে এসেছেন। আবার যখন আপনার স্বামী স্বরাজ্য ফিরে পাবেন—সেদিন আবার সেই জুলুমের আনন্দ ফিরে পাবেন।'

অপ্রিয় কথা, কিন্তু সত্যি। রানী ব্যথিত মুখে চেয়ে রইলেন।

আবার সেই হাঁক উঠল, 'হেই—হেই, রাজকুমারী পদ্মাবতী যাচ্ছেন—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।'

একে ঠেঙিয়ে, ওকে তাড়া করে হুমহুম করে ছুটে আসছে মগধ-রাজকুমারীর পাইক বরকন্দাজ। আশ্রমবাসীরা ভয়চকিত—এদিক ছুটে তো ওদিক পালায়।

এমন সময় রাজকুমারীর অন্দরমহলের দ্বাররক্ষী কঞ্চুকী একজন হেঁকে উঠল, 'এমন করে তাড়া লাগাসনে। নগর-রাজধানী ছেড়ে আশ্রম-বাসীরা এখানে আছেন শান্তির জন্য।'

তার কথা শুনে মন্ত্রী বললেন, 'মহারানী, এ লোকটিকে ভালো বলেই মনে হচ্ছে। চলুন, ওর কাছে যাই।'

মন্ত্রী গেলেন কঞ্চুকীর কাছে। শুধোলেন, 'কেন এত হাঁকাহাঁকি?'

কঞ্চুকী হাত-পা নেড়ে অনেক ঘের-ফের ঢের ঢের করে বললে, 'মগধের যে মহারাজ, যাঁর বাপ-পিতামহ নাম রেখেছেন দর্শক, তাঁর যে ছোট বোন, যার নাম কি-না রাজকুমারী পদ্মাবতী—তিনি যাচ্ছেন আশ্রমে। তাঁর যে মা-জননী মহাদেবী, যিনি আবার কি-না আশ্রম-

বাসিনী, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই রাজকুমারীর ইচ্ছে। আজ তিনি আশ্রমেই থাকবেন—আপনারাও আসুন, তাঁর অতিথি হবেন।' মগধ-রাজকুমারীর পরিচয়—সে কী সহজে স্বল্পে শেষ হয়?

বাসবদত্তা দেখলেন—রাজকুমারী পদ্মাবতী যাচ্ছেন, রূপে পথ আলো। এঁর কথা আগেই তিনি শুনেছেন। বুকে তাঁর উথলে ওঠে বড় বোনের স্নেহ।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দেখলে—এই সেই মগধ-রাজকুমারী, যাঁর সঙ্গে তাঁর মহারাজের বিয়ে হবে, জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছেন। তাতে মহারাজের হৃতরাজ্য আবার পুনরুদ্ধার হবে। এখন এই বিয়েটি ঘটাতে পারলেই তাঁর কার্যোদ্ধার। পরিব্রাজকের বেশে তাই মগধে এসেছেন নানা ফন্দি এঁটে।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বুদ্ধিতে অতুল। তবু তাঁর রাজা উদয়ন আজ রাজ্যহারা, তাঁর বৎসরাজ্য আরুণি নামে পরাক্রান্ত এক রাজা গ্রাস করেছে। একা মন্ত্রী আর কি করবেন—রাজা যদি রাজ্য না দেখেন! উদয়ন না রাজা মেজাজে, না রাজা কাজে—তিনি রাজা শুধু নামে! তাঁর এক কাজ হাতী শিকার, আর এক কাজ রানী বাসবদত্তাকে তাঁর সাধের বীণা শেখানো। বীণা তো নয়, যেন সাপের মন্ত্র, তাঁর সে বীণা শুনে বনের পশুপাখিও পাগল হয়ে ওঠে। রাজা সে বীণার নাম রেখেছেন 'ঘোষবতী'। এই উদাসী রাজার রাজ্যে মন নেই, রাজকাজে প্রাণ নেই—সব মনটুকু জুড়ে আছে শিকার, রানী আর ঘোষবতী বীণা। ফলে শিথিল হল রাজশক্তি, স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীরা অত্যাচার করতে লাগল প্রজাপুঞ্জের উপর। শেষ পর্যন্ত দুর্বল রাজবাহু না পারল প্রজা রক্ষা করতে, না পারল নিজেকে রক্ষা করতে। পরাক্রান্ত পররাজ্যলোলুপ আরুণি বৎসরাজ্য আক্রমণ করে অধিকার করে বসল।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সকলকে নিয়ে এলেন লাবাণক নামে এক গ্রামে। আর ভেবে মরেন একা—কি করা যায়, কিসে উদ্ধার হয় রাজ্য। কেমন করে রাজার মতি ফেরে রাজ-পাটে।

একদিন তিনি রাজাকে না জানিয়ে গোপনে ডাকলেন এক মন্ত্রণা-সভা। তাতে ডাকা হল স্বয়ং রানী বাসবদত্তাকে, এলেন সেনাপতি

রুমণ্বান, উপস্থিত থাকলেন কয়েকজন আচার্য জ্যোতিষী আর রাজা উদয়নের প্রিয় সহচর বসন্তক।

মন্ত্রী বললেন, 'এখন কি করা যায়? রাজার তো কোনোদিকে খেয়াল নেই।'

রাজজ্যোতিষী পুষ্পকভদ্র বললেন, 'মগধের রাজকন্যার সঙ্গে রাজার বিবাহের প্রবল যোগ বর্তমান এবং এই বিয়েতেই হবে রাজার রাজ্যোদ্ধার।'

শুনে মন্ত্রী কঠিন কণ্ঠে বললে, 'মহারানী, আপনাকে রাজার চোখের আড়াল হতে হবে, কঠিন হতে হবে। ছদ্মবেশে আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

রানী শুধোলেন 'কোথায় যেতে হবে?'

মন্ত্রী বললেন, 'মগধে। সেখানে গিয়ে আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে মগধ রাজকুমারীর সঙ্গে, যেমন করে হোক। এই বিতাড়িত অবস্থায় বাইরের সৈন্য সাহায্য ছাড়া রাজ্যোদ্ধার হবে না।'

রানী বাসবদত্তা বললেন, 'কিন্তু মগধরাজ যে বলেছেন—এক স্ত্রী থাকতে তাঁরা মেয়ে দেবেন না! যাই হোক, আমার রাজার সম্মান ও রাজ্য উদ্ধারের জন্য দরকার হলে আমি আত্মহত্যা করতে পারি। সব কিছুর জন্য আজ আমি প্রস্তুত।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারানীর জয় হোক। আপনার আত্মহত্যার প্রয়োজন হবে না। আমরা সবাই প্রচার করে দেব, আপনি মৃত। যতদিন না রাজ্য উদ্ধার হয় ততদিন রাজা যেন এসব কথা কিছুই না জানতে পারেন। সবাই হুঁশিয়ার!...'

এই বলে মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হল।

কিন্তু কিসের মন্ত্রণা—কিসের কি, রাজার ওদিকে খেয়াল নেই। তিনি তখন বেরিয়ে গেছেন মৃগয়ায়। এই সুযোগে মন্ত্রী আগুন লাগিয়ে দিলেন লাবাণকের যত চালাঘরে। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সে-সব।

তারপর রানী বাসবদত্তাকে সামান্য এক অবন্তির মেয়ের মত সাজিয়ে যৌগন্ধরায়ণ নিজে নিলেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ। রওয়ানা

হলেন সুদূর মগধের দিকে। যাওয়ার সময় বসন্তক আর সেনাপতি রুমণ্বানকে বলে গেলেন, 'রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এলে বল—তাঁর প্রিয়মন্ত্রী আর মহারানী এই আগুনে পুড়ে মরেছেন। আর দেখ, রাজ্য উদ্ধারের আয়োজন যেন শিথিল না হয়। মহারাজকে মগধের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা কর।'

এত সব করে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ছদ্মবেশে এসেছেন মগধে। দৈবাৎ বনের পথেই দেখা হয়ে গেল মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে। দুইজনেই তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। যেমন করে হোক, এরই সঙ্গে দিতে হবে মহারাজ উদয়নের বিয়ে, মিতালি করতে হবে মগধরাজ দর্শকের সঙ্গে, নিতে হবে তাঁর সেনানীর সাহায্য।

কঞ্চুকীর আমন্ত্রণে তুজনে মহাদেবীর আশ্রমে এলেন। এসেই বাসবদত্তা লেগে গেলেন পদ্মাবতীর নানা খবর সংগ্রহে। রাজকুমারীর একজন সহচরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজকুমারীর কোনও বিয়ে-থার কথা হচ্ছে না?'

সহচরী বললে, 'হচ্ছে বটে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।'

শুনে মুখ শুকিয়ে গেল বোধ করি বাসবদত্তার। উজ্জয়িনীর রাজপুত্র যে তাঁর ভাই! হায়, এখন কোন্ কুল রাখবেন তিনি!

এদিকে রাজকুমারী পদ্মাবতী আশ্রমে এসে মুনিঋষিদের খুব দান-খয়রাত করতে লাগলেন। তাঁর কঞ্চুকী প্রায় ফিরিওয়ালার মত হেঁকে বেড়াতে লাগল—'কার কলসী চাই? কাপড় নেবে কে? কোন বিদ্যার্থীর গুরু-দক্ষিণার অভাব পড়েছে? চলে এস যার যা চাই। রাজপুত্রী খয়রাত করছেন।'

যৌগন্ধরায়ণ আর বাসবদত্তা দেখলেন—পদ্মাবতীর রানী হওয়ার মত বড় মন আছে বটে!

যৌগন্ধরায়ণ গিয়ে হাজির হলেন পদ্মাবতীর কাছে। বললেন, 'আমি একজন প্রার্থী।'

পদ্মাবতী শুধালেন, 'কি চাই আপনার?'

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, 'আমি পরিব্রাজক—অর্থ সম্পদ কিছুই চাইনে।' তারপর বাসবদত্তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আমার ছোট বোন, স্বামী এঁর বিদেশে আছে। এঁকে কিছুদিন আপনার কাছে রাখতে হবে। এই আমার প্রার্থনা।'

পদ্মাবতী রাজী হলেন। বললেন, 'এঁর নাম?'

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, 'অবন্তিকা।'

রানী বাসবদত্তার মুখ শুকিয়ে গেল। হায়, রানী হয়ে অন্যের আশ্রয়েও তাঁকে থাকতে হবে! কিন্তু উপায় নেই—মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মন্ত্রণা। উদ্দেশ্য তাঁর মহৎ।

এমন সময় এক ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী যুবক আশ্রমে এসে হাজির। রাতটুকু থেকে সকালেই চলে যাবেন।

কঞ্চুকী শুধালে, 'মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'লাবাণক থেকে, আমি সেখানে পড়তাম। সেখানে মর্মান্তিক এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ায় চলে এসেছি।'

লাবাণকের কথা শুনে চমকে উঠলেন যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা। সেই অগ্নিকাণ্ডের পর রাজা উদয়ন কি করছেন তা জানবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল হল দুজনেরই। আশ্রমবাসীরা এবং রাজকুমারী পদ্মাবতীও ভয়ানক উৎসুক। সবাই তাকে ঘিরে বসল।

ব্রহ্মচারী বললেন রাজা উদয়নের করুণ কাহিনী। উদয়ন মৃগয়া থেকে ফিরে বাসবদত্তা মারা গেছেন শুনে পাগলের মত হয়ে উঠলেন। যে আগুনে বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন—তাতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। অমাত্যরা তাঁকে কোনও রকমে সে দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু তারপর থেকে মহারাজ উদয়ন শুধু 'বাসবদত্তা—বাসবদত্তা' বলে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যৌগন্ধরায়ণ অদম্য কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনও তাঁরা সে গ্রামেই আছেন?'

'আজ্ঞে না!' ব্রহ্মচারী বললেন, 'সেই গ্রামের পথঘাট গাছপালা সব রানী বাসবদত্তার স্মৃতির সঙ্গে জড়ান—রাজা তারই মধ্যে পাগলের

মত রাত-দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তাই অমাত্যরা শেষ পর্যন্ত রাজাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।'

যৌগন্ধরায়ণ শুনে আশ্বস্ত হলেন। আর সকলের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বাসবদত্তা কিন্তু আর সামলাতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

পদ্মাবতী বললেন, 'ইনি দেখছি বড় কোমল হৃদয়া।'

যৌগন্ধরায়ণ অবস্থা সামলে নিলেন। বললেন 'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি কারুর দুঃখের কথা শুনতে পারেন না।'

ব্রহ্মচারীর মুখে উদয়নের কথা শুনে পদ্মাবতী ভাবে বিভোর। আহা, ধন্য রানী বাসবদত্তার ভাগ্য! এ যেন স্বামী-সৌভাগ্যবতী সীতা!

যৌগন্ধরায়ণ সেই রাত্রে রাজকুমারী পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে রেখে কোথায় চলে গেলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতী ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তাকে নিয়ে রাজপুরীতে পরের দিন ফিরে গেলেন। বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে দেখেন ছোট বোনের মত। পদ্মাবতীও তাঁকে রাখেন নানা যত্নে আদরে। বাসবদত্তাকে তাঁর বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু কোনদিন তিনি নিজের কথা বলেন না। বরং উল্টে বাসবদত্তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান পদ্মাবতীর মনের কথা—আর কত গল্প করেন মহারাজ উদয়নের, মহা-রাজের নানা কথায় জয় করেন পদ্মাবতীর মন।

একদিন শুধালেন বাসবদত্তা, 'কি হল সেই উজ্জয়িনীর রাজকুমারের? কই বিয়ের খবর তো আর কিছুই পাইনে।'

পদ্মাবতীর এক সহচরী বললে, 'রাজকুমারী তাঁকে বিয়ে করবেন না। রাজকুমারীর ইচ্ছে—রাজা উদয়নের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।'

বাসবদত্তা বুঝলে—উদয়নের গল্প-কথায় এতদিন বুঝি ফল ফলেছে।

একটি সহচরী বললে, 'কিন্তু রাজা উদয়ন যদি কুৎসিত হন?'

বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না না, তিনি অতি সুন্দর—সুপুরুষ।'

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি করে জানলেন?'

বাসবদত্তার ভয় হল—এই বুঝি তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তাই একটু সামলে নিয়ে কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'সবাই তাই বলে।'

এমন সময় পদ্মাবতীর ধাত্রী এসে খবর দিলেন, 'রাজকুমারী, তোমার সঙ্গে উদয়নের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। রাজা উদয়ন কি এক রাজকার্যে মগধে আমাদের মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বিয়েও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল।'

বাসবদত্তা বুঝলে—এ রাজকার্য আর কিছুই নয়, সেনাসাহায্য প্রার্থনা ও মিতালি। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কাজ তাহলে চলেছে ঠিক—বিধির অমোঘ বিধানের মত।

দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যে সেজে উঠল মগধের রাজপুরী—বেজে উঠল বিয়ের মঙ্গলশঙ্খ। মালা গাঁথতে বসলেন স্বয়ং বাসবদত্তা—সেকালের সে কত রকমের মালা! কোনও মালা চির সুখের—কোনও মালাতে হয় চির এয়োতি—কোনও মালা বা সতীন-কাঁটার। এই শেষ মালাটা গাঁথতে গাঁথতে চোখে জল আসে বাসবদত্তার। হায়রে ভাগ্য, অবস্থার বিপাকে রাজকুমারী পদ্মাবতীর সতীন-কাঁটার মালা আজ গাঁথতে বসেছে সতীন বাসবদত্তা। ওদিকে নহবৎখানায় বাঁশি ধরেছে মিলনের তান।

মগধে এসে বিয়েই হোক আর মিতালিই হোক—রাজা উদয়নের কিন্তু মনে সুখ নেই। তাঁর মনে সেই বাসবদত্তার হাজার কথার স্মৃতি। সে কি সহজে মোছা যায়?

প্রিয় সহচর বসন্তক কত কথায় মন ভোলাতে চান রাজার—পদ্মাবতীর গুণগানে মন ভরে দিতে চান। কিন্তু শত কথাতেও সেই বাসবদত্তার কথা মনে করে রাজার চোখে শুধু জল আসে।

আর ওদিকে রাজার এই অবস্থা দেখে আড়াল থেকে চোখের জল মোছেন ছদ্মবেশিনী অবন্তিকা। মনে মনে বলেন—ভুলে যাও মহারাজ, ভুলে যাও হতভাগিনীর কথা।

এমনি করে দিন কাটে উদাসীন রাজা উদয়নের। এর মধ্যে একদিন মাথা ধরল পদ্মাবতীর। মগধ রাজকুমারীর মাথা ধরা—সে কি সহজ কথা! সারা মগধ বুঝি তোলপাড়! পাইক ছোটে,

বরকন্দাজ ছোটে, রাজবদ্যি ছোটে, খবর চলে যায় এখান থেকে ওখানে। খবর এল রাজা উদয়নের কাছে, 'রানী পদ্মাবতীর মাথা ধরেছে। সমুদ্রগৃহে তাঁর বিছানা পাতা হচ্ছে—সেইখানে তিনি বিশ্রাম নিতে যাবেন।'

সমুদ্রগৃহ—সমুদ্রের মত শান্ত আর ঠাণ্ডা। সেকালের রাজ-রাজড়াদের প্রাণ জুড়োবার ঠাঁই। রাজা উদয়ন চললেন সেই সমুদ্র-গৃহের দিকে। সন্ধ্যে তখন হব-হব। রাজা গিয়ে দেখলেন—রানী পদ্মাবতী তখনও সমুদ্রগৃহে আসেননি।

ভাবলেন—হয়তো আসবেন পরে। তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন। রাজ্য উদ্ধার ও যুদ্ধের চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। আরুণিকে উচ্ছেদ করবার জন্য নানা কৌশলে তিনি সৈন্য পরিচালনা করছেন—সারাদিন মেতে থাকেন এখন তাই নিয়ে। সমুদ্রগৃহের ঘুম-ঘুম আলো আর গা জুড়ানো ঠাণ্ডায় উদয়ন ঘুমিয়ে পড়লেন!

এমন সময় পদ্মাবতীর মাথা ধরার কথা শুনে বাসবদত্তাও এলেন সেই সমুদ্রগৃহে। এসে দেখলেন ঘুমন্ত ক্লান্ত উদয়নকে। দেখলেন তো দেখলেনই—চোখ ফেরাতে পারলেন না। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কঠিন নির্দেশ যেন ভুলে গেলেন সেই মুহূর্তে। দেখলেন—রাজার একটা হাত ঘুমের ঘোরে ঝুলে পড়েছে। 'আহা কষ্ট হচ্ছে'—বলে যেমনি সেটা তুলে দিতে যাবেন, অমনি রাজা জেগে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসবদত্তা ছুটে ঘরে থেকে বেরিয়ে মিশে গেলেন বাইরের অন্ধকারে।

উদয়ন চীৎকার করে উঠলেন, 'বসন্তক—বসন্তক, বাসবদত্তা বেঁচে আছে!—বাসবদত্তা···বাসবদত্তা!'

কোথায় বাসবদত্তা! অন্ধকারে হা-হা করে উঠল রাজার করুণ আর্তনাদ। বাসবদত্তার ছায়ামূর্তিকে ছুটে ধরতে গিয়ে উদয়ন সমুদ্র-গৃহের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বসন্তক ছুটে এসে সেবা শুশ্রূষা করে রাজার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভুলে যান মহারাজ—তাঁর কথা ভুলে যান। তিনি যে বহুদিন মারা গেছেন। আপনি তাঁকে বোধ করি স্বপ্ন দেখেছেন।'

উদয়ন বললেন, 'না না না বসন্তক—যদি তা স্বপ্ন হয় তা হলে আমার সেই ভ্রান্তিই চিরকাল থাক অক্ষয় হয়ে।'

বসন্তক তবু বললেন, 'এই রাজপুরীতে অবন্তিকা নামে এক যক্ষিণী বাস করে—আপনি তা হলে তাকেই দেখেছেন।'

'না না না।' উদয়ন বললেন, 'আমি স্বচক্ষে যে তার মুখ দেখেছি বসন্তক! সে আছে সন্ন্যাসিনীর মত। চোখে তার কাজল নেই, গায়ে নেই অলঙ্কার, মেঘের মত কেশরাশি তার সাজ-সজ্জাহীন। বাসবদত্তা বেঁচে আছে বসন্তক্।' রাজার বিলাপ আর থামে না।

এমন সময় এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'রাজা উদয়নের জয় হোক। আপনার সেনাপতি রুমণ্বান আরুণিকে উচ্ছেদ করেছেন। এখন আপনি বিজয় অভিযান করতে পারেন। বৎসরাজ্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রাজা দর্শকের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক প্রস্তুত।'

হঠাৎ এই বিজয়সংবাদে রাজা কিছুটা সুস্থ হলেন।

তারপর বিজয়োৎসব করে আপন রাজ্যে ফিরে এলেন রাজা উদয়ন—সঙ্গে এলেন রানী পদ্মাবতী আর তাঁর সহচরীরা। তাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চললেন ছদ্মবেশিনী অবন্তিকা।

বৎসরাজ্যে ফিরে এসে রাজা উদয়ন রাজ্যপাটে মন দিলেন বটে, কিন্তু আধখানা মন তবু পড়ে রইল রানী বাসবদত্তার জন্য।

রাজার সে মন পুড়ে হু-হু করে উঠল একদিন। রাজার সূর্যমুখ প্রাসাদের সামনে এসে বীণায় ঝঙ্কার তুলছিল কে এক বীণকার—উদয়ন চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ঘোষবতী! হায়, এ যে ঘোষবতীর সুর।'

ভোলা যায় কী ঘোষবতী বীণার সুর! রাজা বললেন, 'ধরে আন বীণকারকে?'

রক্ষীরা গিয়ে বীণকারকে ধরে আনল।

রাজা শুধালেন, 'কোথায় পেলে এ বীণা?'

বীণকার বললে, 'পেয়েছিলাম একে লাবাণকের এক উলু-খাগড়ার বনে।'

বীণা কোলে নিয়ে উদয়ন হা-হুতাশ করতে লাগলেন। হায়! তাঁর সাধের বীণা ফিরে এল কিন্তু কোথায় গেল রানী বাসবদত্তা!

এরপর একদিন পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা বসে আছেন, বসে আছেন রানী পদ্মাবতী। এমন সময় কঞ্চুকী এসে খবর দিলে, 'অবন্তিকাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই পরিব্রাজক এসেছেন!'

রাজা শুধালেন, 'কি ব্যাপার? কে অবন্তিকা?'

রাজা এ সবের কিছুই জানতেন না। পদ্মাবতী বললেন, 'তখন আমার বিয়ে হয়নি—একদিন এক পরিব্রাজক এসে তাঁর বোনকে রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে। অবন্তিকা তারই নাম।'

রাজা প্রতিহারীকে বললেন, 'ডেকে আন সেই পরিব্রাজককে।'

আর পদ্মাবতী কঞ্চুকীকে বললেন, 'ডেকে আন অবন্তিকাকে।'

প্রতিহারী পরিব্রাজকবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে নিয়ে হাজির করলে রাজা উদয়নের কাছে। কিন্তু ছদ্মবেশী সে পরিব্রাজককে চিনে ফেললেন

রাজা উদয়ন। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ! তুমি! কে তোমার বোন, বল।'

কঞ্চুকী তখন এনে হাজির করেছে ছদ্মবেশিনী অবন্তিকাকে।

ঘোমটা সরিয়ে নিয়ে বাসবদত্তা এই সময়ে বলে উঠলেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

'বাসবদত্তা!' উদয়ন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রানী বাসবদত্তার দিকে।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলেন রাজার—বললেন, 'দেবী বাসবদত্তাকে লুকিয়ে রেখে আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন। যা কিছু করেছি, তা শুধু বৎসরাজ্য উদ্ধারের জন্য।'

রাজা উদয়ন তাঁকে দুহাতে টেনে তুলে বললেন, 'ওঠ, তোমার জন্যই সব কিছু রক্ষা পেয়েছে যৌগন্ধরায়ণ—তুমি আমার পরম সুহৃদ।'

পদ্মাবতী বাসবদত্তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমিই রানী বাসবদত্তা! আমায় ক্ষমা কর দিদি। সখীর মত আচরণ করে তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি আমি! তুমি আমার বড়—তোমাকে প্রণাম করি কোটি কোটি।' বলে গড় হয়ে বাসবদত্তাকে প্রণাম করলেন।

তারপর থেকে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন রাজা উদয়ন। তাঁর রাজ্য জুড়ে নেমে এল অপার আনন্দ ও সুগভীর শান্তি।

....

মাটির গাড়ি

শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' থেকে

উজ্জয়িনী তো নয়—যেন সে কোন সুদূর কালের কল্পনার এক রাজ্য! তার রাজপথের দুপাশে কত আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদের সারি, প্রাসাদের সামনে কারুকাজ করা কত হাতীর দাঁতের তোরণ, মাঝে মাঝে ছবির মত আঁকা কত উদ্যান, পুষ্পবীথি—আর ছায়াশীতল শ্বেত-পাথরের শিলাতল। মানুষজনের গায়ে জুঁইফুলের গন্ধমাখা ওড়না আর মণি-মুকুতায় ঝলোমল কেয়ূর-কঙ্কণ-কণ্ঠহার। শুধু কি ধনদৌলতের জাঁকজমক—শখ-শৌখিনতারও চৌষট্টিকলা! আঙিনায় আঙিনায় ঘুঙুর-পরা ময়ূরের নাচন, ঘরে ঘরে চন্দন ঘষা আর অগুরু ধূপের ধোঁয়ায় নিত্য লেগে আছে যেন পূজোবাড়ির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। কোথাও বা বীণার ঝঙ্কার আর নৃত্যের তালে তালে নূপুরের নিক্কণ। মাঝে মাঝে দূরের শিপ্রানদীর তীর থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে মহাকাল মন্দিরের ঘণ্টা—ঢং ঢং, ঢং ঢং। চির-উৎসবে মুখরিত প্রাচীন ভারতের সে এক উজ্জ্বল উজ্জয়িনী।

তার বণিকদের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। নানা দেশ-দেশান্তর থেকে নানা ধনরত্ন আহরণ করে এনে উজ্জয়িনীকে করে তুলেছিল তারা সুসমৃদ্ধ এক জনপদ। মঠে মন্দিরে, প্রাসাদে উদ্যানে, কত দীঘি আর দানসত্রে সারা উজ্জয়িনী জুড়ে ছিল তাদের কীর্তি। যেমন ছিল তাদের ধন-দৌলতের খ্যাতি—তেমনি প্রতিপত্তি। তার মধ্যে আবার বণিক তো বণিক চারুদত্ত। এই ব্রাহ্মণ বণিকটি যেমন ছিলেন ধনী তেমনি দাতা। এমনি তাঁর বাড়-বাড়ন্ত দানের বহর যে, তা বাড়তে বাড়তে একদিন তিনি একেবারে ফতুর হয়ে গেলেন। ধনদৌলত যেমন এসে-ছিল তেমনি চলেও গেল—রয়ে গেল শুধু নামটি, যে নাম হেলে না, টলে না আর মোছেও না।

শুধু দান নয়, দয়া নয়—চারুদত্ত বিপন্নেরও বন্ধু। একদিন তিনি পুষ্প-করণ্ডক নামে এক বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিল চিরসহচর মৈত্রেয়। এমন সময় তাঁর গোরুর গাড়ি এসে থামল বাগানের সামনে। তাঁকে অবাক করে দিয়ে তাঁরই গাড়ি থেকে নামল একজন অচেনা লোক। আলো-আঁধারির সময় ভালো করে তাকে চেনা গেল না—তবে চারুদত্তের মনে হল, এ লোক কেউ-কেটা না হয়ে যায় না। দিব্যি আজানুলম্বিত ছুটি বাহু, সিংহের মত কাঁধ, বিশাল বুকের পাটা আর ডাগর ডাগর চোখ। কিন্তু এক পায়ে তার ছেঁড়া শেকল। চারুদত্ত অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কে হতে পারে!

চারুদত্ত শুধোলেন, 'কে আপনি?'

অচেনা সুদর্শন লোকটি বললেন, 'গোপকুলে আমার জন্ম, আমার নাম আর্যক। আজ আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম।'

আর্যক!' চারুদত্ত অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কি সেই আর্যক, রাজা পালক যাঁকে ঘোষপল্লী থেকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন?'

আর্যক বললেন, 'আমিই সেই আর্যক।'

বেচারী আর্যকের মহাশত্রু উজ্জয়িনীর রাজা পালক। কোনও এক সিদ্ধপুরুষ নাকি রাজা পালককে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিল, রাজাকে মেরে এই গোপসন্তান আর্যক একদিন উজ্জয়িনীর রাজা হবে। যেই শোনা অমনি রাজা পালক বেচারী আর্যককে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ সব ঘটনা চারুদত্ত সব জানতেন। সেই আর্যক যে কারাগার ভেঙে পালিয়ে এসে তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এতে চারুদত্তের খুব অবাক হবারই কথা। মৃদু কণ্ঠে আর্যককে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন। শরণাগতের জন্য আমি দরকার হলে জীবন পর্যন্ত দেব।' তারপর চারুদত্ত তাঁর গাড়োয়ানকে ডেকে বললেন, 'দাও, ওঁর পায়ের শেকল খুলে দাও।'

চারুদত্তের গাড়োয়ান বেচারী এ সবের কিছুই জানত না। মুখ-আঁধারির মধ্য দিয়ে সে শুধু গাড়ি চালিয়েই এসেছে। আর্যক যে কখন

পেছন দিয়ে তার গাড়িতে উঠেছে, তা তার জানা ছিল না। আর্যকের পা থেকে শেকলটা খুলে নিয়ে সে শুধু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আর্যক মৃদু হেসে বলল, 'এ শেকল গেল, কিন্তু বন্ধুত্বের নতুন এক শেকলে বাঁধা পড়লাম। আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ রইলাম।'

চারুদত্ত বললেন, 'আর বেশীক্ষণ আপনার এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ রাজার লোক নিশ্চয়ই আপনার খোঁজ-খবর করছে। আপনি আমার গাড়িতে করেই যেখানে ইচ্ছে যান। হেঁটে যাবেন না। কারণ, বহুদিন আপনার পায়ে শেকল বাঁধা ছিল—আজই সবে খোলা হল। তাই সহজভাবে হাঁটতে পারবেন না, আর খুঁড়িয়ে চললে লোকে আপনাকে সন্দেহ করতে পারে।'

আর্যক একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনার বন্ধুত্ব চিরকাল আমার মনে আঁকা থাকবে। আপনার জন্যই আজ রক্ষা পেলাম।'

এই হল মহৎ মানুষ চারুদত্ত।

কিন্তু মহতেরও শত্রু আছে। চারুদত্তের একজন শত্রু ছিল—সে হল রাজা পালকের শ্যালক সংস্থানক। লোকটা যেমন মুখ্যু—তেমনি গোঁয়ার। চারুদত্তের ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা। সে ছাড়া উজ্জয়িনীর আর সবাই চারুদত্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—যতই তিনি দরিদ্র হোন না কেন।

তাঁর দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য একবার রাজনর্তকী বসন্তসেনা তাঁর বহুমূল্য গয়নাগাঁটি পাঠিয়ে দিলেন চারুদত্তের কাছে। কিন্তু শত অভাবেও তিনি তা নিলেন না। বসন্তসেনার ধন-রত্নের অভাব নেই, স্বয়ং রাজা পালক থেকে দেশশুদ্ধ সবাই এই গুণবতীর গুণে মুগ্ধ—শুধু তাই নয়, দয়াদাক্ষিণ্যেরও তাঁর অন্ত নেই। কিন্তু চারুদত্তকে তিনি কি ভাবে সাহায্য করবেন—ভেবে পেলেন না।

একদিন তিনি স্বয়ং চারুদত্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বসন্তসেনার ভাগ্যি ভালো, একটা দানের সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

চারুদত্তের একমাত্র ছেলে রোহসেনকে নিয়ে বাড়ির দাসী ঠিক তখনই বাইরে বেরিয়ে এল। রোহসেন কেঁদে আকুল—আর দাসী তাকে নানা কথায় ভুলোবার চেষ্টা করছে। বসন্তসেনা কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

দাসী রোহসেনের হাতে একটা মাটির গাড়ি ধরে দিয়ে বললে, 'ওই গাড়িটাই খুব ভালো বাছা—এস আমরা এইটে নিয়ে খেলা করি।'

রোহসেন রাগ করে মাটির গাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'না না—আমায় সেই গাড়ি দাও। এ চাইনে—'

দাসী দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওরে—সোনার গাড়ি এখন কোথায় পাবি বাছা। তোর মায়ের গায়েও যে একদানা সোনা নেই।'

বসন্তসেনা রোহসেনকে আদর করে বললেন, 'কাঁদছ কেন?'

দাসী বললে, 'পাশের বাড়ির একটি ছেলে সোনার গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল—সেইটে ওর চাই। মাটির গাড়ি একটা এনে দিলাম, কিন্তু ও সেটা নেবে না।'

'তাই কান্না?' বসন্তসেনা রোহসেনকে আদর করে বললেন, 'চাইনে আমরা মাটির গাড়ি। সোনার গাড়ি তোমায় দিচ্ছি বাবা।' এই বলে বসন্তসেনা তাঁর গায়ের বহুমূল্য সব মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার খুলে রোহসেনের সেই মাটির গাড়িতে ভর্তি করে বললেন, 'এই নাও, এই দিয়ে তোমার সোনার গাড়ি বানিয়ে নিও।'

এই ভাবে অলঙ্কারগুলি গছিয়ে দিয়ে বসন্তসেনা চলে গেলেন।

দাসী ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

কিন্তু হায়, বসন্তসেনার অলঙ্কারে ভর্তি রোহসেনের এই মাটির গাড়িই হল চারুদত্তের কাল। কারণ, পরের দিনই রাজার বিচারশালায় মোকদ্দমা উঠল—পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে এক ঝোপের মধ্যে বসন্তসেনা নিহত হয়েছেন এবং রত্নভূষিতা বসন্তসেনার গায়ে অলঙ্কার একটিও নেই—সব কে কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে।

রাজা পালকের শ্যালক—প্রতাপ প্রতিপত্তিও তার অসীম; তার ওপরে গোঁয়ার এবং মুখ্যু। পরের দিন বিচারালয়ে গিয়ে সে নালিশ করলে, 'রাজনর্তকী বসন্তসেনাকে চারুদত্তই মেরে ফেলেছে।'

এই অসম্ভব কথা শুনে স্বয়ং বিচারক পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক।

চারুদত্তকে চেনে না কে! কে না জানে তাঁর অমায়িক ব্যবহার। তিনি এমন কাজ করবেন—এ কথা স্বয়ং বিচারকও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবুও উপায় নেই—বিচারের দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে।

বিচারক বললেন, 'কি হয়েছে বলুন।'

সংস্থানক স্পর্ধাভরে বললে, 'কানে কানে বলব। আমি তো যে-সে লোক নই। কত বড় কুলে আমার জন্ম! রাজার শ্বশুর আমার বাবা, আমি স্বয়ং রাজার শালা!'

ওর আস্ফালন দেখে বিচারক বোধ হয় একটু হাসলেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি কে। কোন্ কুলে কার জন্ম, এ কথা বিচারালয়ে চলে না। উর্বর জমিতে কি আর কাঁটা গাছ জন্মায় না? স্বভাব চরিত্র নিয়েই আমাদের কাজ। এখন আসল ঘটনাটা বলুন।'

সংস্থানক বললে, পুষ্প-করণ্ডক বাগানটা রাজা খুশী হয়ে আমাকে উপহার দেন। জানেন তো, বাগানটি খুবই বিখ্যাত—ওখানে অনেকেই বেড়াতে যায়। আমি আজ গিয়ে দেখলাম, উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজ-নর্তকী বসন্তসেনা বাগানের এক প্রান্তে এক ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে। গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই—বোধ হয় কেউ ওইগুলোর লোভে তাকে হত্যা করেছে!'

বিচারক বললেন, 'আপনি কি করে বুঝলেন যে, কেউ অর্থের লোভে তাঁকে হত্যা করেছে?'

সংস্থানক বললে, 'গায়ে তার একটিও অলঙ্কার নেই যে! বসন্তসেনা উজ্জয়িনীর গৌরব, নানা রত্নে সে ভূষিতা—তার গায়ে অলঙ্কার নেই কেন? নিশ্চয়ই কেউ সেগুলো কেড়ে নিয়ে গেছে। তার গলায় হার ছিনিয়ে নেওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত আছে।'

'সম্ভব!' বিচারকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সক্ষোভে বললেন, 'নগর-রক্ষীরা আজকাল কিছুই কাজ করছে না।' তারপর তিনি তাঁর কর্মচারীদের হুকুম করলেন, 'যাও—চারুদত্ত মশায়কে ডেকে আন।'

চারুদত্ত বসন্তসেনার এত সব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। তিনি

শুধু জানতেন—গতকাল বসন্তসেনা এসে আবার সেই সাহায্যের ছলে তাঁর ছেলের মাটির খেলনা-গাড়িটা বহুমূল্য নানা অলঙ্কারে ভরে দিয়ে গেছেন। সেগুলো তিনি তাঁর বন্ধু মৈত্রেয়ের হাতে আজ আবার ফেরত পাঠিয়েছেন। এমন সময় বিচারশালার লোক এসে বললে, 'কোনও ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস জানবার জন্য বিচারক আপনাকে একবার ডেকেছেন।'

তারা বসন্তসেনার হত্যাব ব্যাপারে কিছুই বললে না।

চারুদত্ত চললেন বিচারালয়ে। মনে ভাবলেন—বোধ করি বা সেই পলাতক বন্দী আর্যকের ব্যাপারেই কিছু জেরা করা হবে তাকে।

বিচারশালায় আসতেই বিচারক চারুদত্তকে বললেন, 'আপনি একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। কয়েকটা কথার এখন জবাব দিন।'

'মোকদ্দমা !' সদাশয় চারুদত্ত কখনও মামলা-মোকদ্দমায় জড়াননি। তাই অবাক হয়ে বললেন, 'কার সঙ্গে আমার মোকদ্দমা ?'

সঙ্গে সঙ্গে সংস্থানক আস্ফালন করে বললে, 'মোকদ্দমা আমার সঙ্গে।'

চারুদত্ত বললেন, 'কি যা-তা বলছ !'

সংস্থানক বললে, 'অলঙ্কারের লোভে উজ্জয়িনীর গৌরব রত্নভূষিতা বসন্তসেনাকে তুমি হত্যা করেছ।'

সংস্থানককে থামিয়ে দিয়ে বিচারক চারুদত্তকে বললেন, 'বসন্তসেনা কি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?'

চারুদত্ত বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন বটে।'

বিচারক আবার জিজ্ঞেস করলেন 'এখন তিনি কোথায় ?'

চারুদত্ত সহজভাবেই বললেন, 'নিশ্চয় তাঁর বাড়িতেই আছেন।'

সংস্থানক এই সময়ে আবার বলে উঠল, 'বাড়িতে না যমালয়ে ? পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে তাকে তুমি হত্যা করে ফেলে রেখে এসেছ, তার সমস্ত অলঙ্কার তুমি চুরি করেছ।'

চারুদত্ত কি আর বলবেন, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। আর দোষ দিলেন নিজের ভাগ্যের—হায়, গরীব হয়ে পড়েছেন বলেই এ অপবাদও আজ তাঁকে শুনতে হচ্ছে।

এই সময় বীরক নামে একজন নগর-রক্ষী বিচারশালায় ঢুকে বললে, 'আমার একটা বিচার করে দিন। রাজা পালক আর্যক নামে যে গোপসন্তানকে বন্দী করে রেখেছিলেন, সে চারুদত্তের গাড়িতে করে পালিয়েছে। আমি তাকে ধরতে গিয়েছিলাম কিন্তু চন্দনক নামে আর একজন নগর-রক্ষী আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এর বিচার চাই।'

বীরকের কথা শুনে চারুদত্ত মনে মনে ভাবলেন—দণ্ড থেকে আর কোন রকমে নিস্তার নেই। একে এই হত্যার অভিযোগ, তার ওপর আর্যকের জন্য গুরুতর অপরাধ—রাজদ্রোহ!

বিচারক বীরককে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার বিচার পরে হবে। এখন পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে গিয়ে দেখে এস তো, সেখানে কোনও স্ত্রী-লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে কি-না। ঘোড়ায় করে ছুটে দেখে এস।'

বীরক চলে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগল। বীরকও তেমনি সাক্ষী। তাছাড়া, সে সংস্থানকের লোক। কিছুক্ষণ বাদেই সে ফিরে এসে বললে, 'দেখে এলাম।'

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখলে?'

বীরক বললে, 'একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।'

বিচারক শুধোলেন, 'কি অবস্থায় দেখলে?'

বীরক বললে, 'আজ্ঞে, শেয়াল কুকুরে সব খেয়ে ফেলেছে।'

অর্থাৎ বীরক গিয়ে কিছুই দেখেনি।

সংস্থানক বলে উঠল, 'তবে দেখুন—চারুদত্তের কীর্তি। চারুদত্ত, এবার নিজের দোষ স্বীকার কর।'

চারুদত্ত আর কি বলবেন—মনে মনে তিনি তখন ডাকতে লাগলেন তাঁর পরম বন্ধু মৈত্রেয়কে, যার হাতে তিনি বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি আজই ফেরত পাঠিয়েছেন। এখন সে এসে যদি বলে—'বসন্তসেনাকে অলঙ্কারগুলো ফেরত দিয়ে এলাম'—তবেই রক্ষা। মনে মনে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন—মৈত্রেয় ফিরতে এত দেরি করছে কেন!

মৈত্রেয়ও তেমনি লোক। হচ্ছে—হবে, যাচ্ছি—যাব—এই রকম তার চরিত্র। অলঙ্কারগুলো নিয়ে সে বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে ঠিকই—কিন্তু অনেক দেরিতে। এমন সময় পথের মাঝখানেই শুনতে পেল—চারুদত্তকে বিচারশালায় ধরে নিয়ে গেছে এবং তাঁর বিচার হচ্ছে। এই শুনেই মৈত্রেয় ছুটতে ছুটতে অলঙ্কার-সুদ্ধ সোজা চলে এল বিচারালয়ে।

চারুদত্তের অবস্থা দেখে মৈত্রেয়ের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। চটে উঠল সে সংস্থানকের ওপর। গোটা বিচারশালাকে সম্ভাষণ করে মৈত্রেয় বললে, 'যিনি পুর-গৃহ, মঠ, উদ্যান, দেবালয়, পুষ্করিণী, কূপ এবং অসংখ্য যজ্ঞস্তম্ভ দিয়ে এই উজ্জয়িনীকে সাজিয়েছেন, দান করে যিনি সর্বাস্বান্ত হয়েছেন, যিনি ফুল তোলবার জন্য মাধবী লতাটিকেও ধরে টানেন না, পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়—তিনি করবেন এই হত্যা? আপনারা এ কথা বিশ্বাস করছেন? আমি জানি, এই সংস্থানকটাই যত নষ্টের গোড়া। লাঠি দিয়ে আমি আজ ওর মাথা ভাঙব।'

'তবে রে!' সংস্থানক আস্ফালন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ও দাঁড়াল রুখে।

সংস্থানক ছুটে এসে মৈত্রেয়কে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। মৈত্রেয়ও ছেড়ে কথা কইলে না। দেখতে দেখতে বিচারশালাতেই একটা প্রকাণ্ড মারামারি লেগে গেল। সেকালে অমন হত।

এই মারামারির মধ্যে মৈত্রেয়ের হাত থেকে বসন্তসেনাকে ফেরত দিতে যাওয়া অলঙ্কারগুলি ছড়িয়ে পড়ল বিচারশালার মেঝেতে।

সংস্থানক সাগ্রহে অলঙ্কারগুলো তুলে নিয়ে দেখল—তারপর চীৎকার করে বললে, 'বিচারকরা দেখুন, এই সব অলঙ্কার বসন্তসেনার। এরই জন্য সে নিহত হয়েছে।'

বিচারকরা স্তম্ভিত।

মৈত্রেয় চারুদত্তকে বললে, 'যা সত্যি—তা তুমি বলছ না কেন বন্ধু?'

চারুদত্ত বললেন, 'আমার সত্যি কথা এখন আর কেউ শুনবে না মৈত্রেয়, এবং ওঁরা ভাববেন—আমি প্রাণের ভয়ে এখন মিথ্যে বলছি।'

বিচারকের কর্মচারীরা শুধোলে, 'এ অলঙ্কারগুলি আপনার?'

চারুদত্ত বিরস কণ্ঠে বললেন, 'না—এ অলঙ্কার বসন্তসেনার। আমার ছেলেকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন।'

সংস্থানক হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'অলঙ্কারের লোভে তাঁকে হত্যা করে এখন আবার মিথ্যে কথা! আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর মৃতদেহ, দেখে এসেছে বীরক।'

চারুদত্ত স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'তবে তাই হোক।'

সংস্থানক বললে, 'নিজের মুখে সে দোষ স্বীকার কর। বল যে—হ্যাঁ, আমিই হত্যা করেছি।'

চারুদত্ত নিরুপায়। নীরবে তাঁকে সব স্বীকার করে নিতে হল। বিচারকরা তাঁর দণ্ড দিলেন নির্বাসন, কিন্তু—রাজা পালক আদেশ দিলেন —যেহেতু অর্থলোভে উজ্জয়িনীর গৌরব বসন্তসেনাকে হত্যা করা হয়েছে, সেহেতু চারুদত্তকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।

রাজার বিচার চূড়ান্ত। তুজন চণ্ডাল, ঘাতক এসে দাঁড়াল চারুদত্তের তুপাশে। তাঁকে সাজাল বলির পশুর মত—গলায় করবীর মালা, গায়ে লেপা রক্তচন্দন। তারপর ট্যাটরা পিটিয়ে তাঁর অপরাধের কথা বলতে বলতে নিয়ে চলল রাজপথ দিয়ে।

এদিকে দেখতে দেখতে ভরে গেল উজ্জয়িনীর রাজপথ হাজার হাজার মানুষে। সেই জনপ্রিয় সদাশয় চারুদত্ত আজ চলেছেন দক্ষিণ মশানে! তাদের মনে কিন্তু অবিশ্বাস। সদাশয় চারুদত্ত এমন কাজ কখনও করতে পারেন না।

কিন্তু রাজার উপরে কথা নেই। তার উপরে আবার প্রচণ্ড শাসন রাজার শালা সংস্থানকের। উজ্জয়িনীর সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে।

চারুদত্ত রাজপথ দিয়ে চলেছেন বধ্যভূমির দিকে—ধীরে, অবিচলিত পদক্ষেপে। কিন্তু হঠাৎ বুঝি পা কেঁপে উঠল তাঁর—রোহসেনের আর্তনাদ শুনে। ঘাতকদের দিকে তাকিয়ে চারুদত্ত বললেন, 'আমার একটি ভিক্ষা আছে তোমাদের কাছে। আমার ছেলের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতে দাও।'

ঘাতকরা অনুমতি দিল।

রোহসেন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। কেঁদে উঠল, 'বাবা! বাবা!'

রোহসেনের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে চারুদত্ত বললেন, 'যাও বাছা—তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।'

ঘাতকরা চারুদত্তকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

রোহসেন চীৎকার করে ঘাতকদের বললে, 'আমার বাবাকে তোমরা মারছ কেন! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওঁকে—কেন নিয়ে যাচ্ছ?'

ঘাতকরা বললে, 'বাছা, এর জন্য রাজাজ্ঞাই অপরাধী, আমরা নই।'

রোহসেন বললে, 'বাবাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমাকে বধ কর।'

ঘাতকরা বললে, 'বাছা, তুমি চিরজীবী হও।' তারপর পথের দু-ধারের লোককে তারা হেঁকে বললে, 'সরে যাও—সবাই সরে যাও। এ তোমরা দেখ না, সহ্য করতে পারবে না। সরে যাও।'

রাজপথের দু-পাশের মানুষ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি পাথরের মত। তাদের চোখে জল। এমন সময় ভারি একটা গোলমাল বেধে গেল। সংস্থানকের ভৃত্য, দাস স্থাবরক কোথায় কোন ঘরের মধ্যে বাঁধা ছিল শেকলে। সেই শেকল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে এসে পড়ল সে ঘাতকদের সামনে। চীৎকার করে সকলকে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'বসন্তসেনাকে চারুদত্ত মারেননি, মেরেছেন আমার প্রভু সংস্থানক। এ ঘটনা আমি জানতাম—তাই প্রভু আমাকে ঘরের মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিল।'

স্থাবরকের পেছনে পেছনে ছুটে এল তার প্রভু সংস্থানক। সকলকে নানা মিথ্যা কথা বলে বোঝাতে লাগল। এক ফাঁকে স্থাবরককে নিজের হাতের সোনার বালা খুলে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'নে—এই বালা দুটো নে, এখন সব আবার মিথ্যে করে বল।'

স্থাবরক চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনারা এই দেখুন—ইনি আমাকে সোনার বালার লোভ দেখাচ্ছেন আবার। আপনারা এর বিচার করুন।'

কিন্তু মূর্তিমান সংস্থানকের সামনে তার কথা টিকল না। সংস্থানক চণ্ডালদের হুকুম দিলেন, 'তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে বধ কর।'

রোহসেন কাঁদতে কাঁদতে বাপের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সংস্থানক চোখ পাকিয়ে বললে, 'তবে বাপ-বেটা দুজনকেই নিয়ে যা মশানে।'

চারুদত্ত আঁতকে উঠে মৈত্রেয়কে বললে, 'রোহসেনকে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও ভাই মৈত্রেয়—নইলে ওর ছোট্ট জীবনটুকুও যে শেষ হয়ে যায়।'

শেষ পর্যন্ত ঘাতকরা রোহসেনকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর তারা তাড়াতাড়ি চারুদত্তকে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। ওদের ক্রমাগত ঢ্যাঁটরা পেটার সঙ্গে সঙ্গে চারুদত্তের অপরাধ বর্ণনা, আর রোহসেনের কান্না—সব মিলে একটা গোলমাল শেষ পর্যন্ত লেগেই রইল।

এই গোলমাল শুনে দূরে থমকে দাঁড়ালেন বসন্তসেনা।

তিনি শেষ পর্যন্ত মরেননি। সংস্থানকের হাতে মরতে বসেছিলেন

ঠিকই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাঁর মুখে জল-টল দিয়ে, সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে কোন রকমে বাঁচিয়ে তোলেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরবার পথে শুনতে পেলেন ঢ্যাঁটরা পেটা আর চারুদত্তের অপরাধের কথা।

বসন্তসেনা কেঁদে ফেললেন, 'হায় হায় আমার জন্য মহাত্মা চারুদত্ত মরতে যাচ্ছেন।' বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বললেন, 'শীগগির আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন।'

বসন্তসেনা প্রায় ছুটে চললেন—আগে আগে পথ করে ছুটলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ঠিক তখনই চারুদত্তকে বধ করবার জন্য ঘাতকেরা তুলেছে খড়্গ। চারুদত্তকে ঘাতকরা বললে, 'রাজার আদেশ। এখন যাদের স্মরণ করবার, তাদের স্মরণ করুন।'

দূর থেকে বসন্তসেনা চীৎকার করে উঠলেন, 'মেরো না—ওঁকে মেরো না। আমি বসন্তসেনা।'

বসন্তসেনা !···

ঘাতকদের হাত থেকে খড়্গ খসে পড়ল।

একজন ঘাতক সবিস্ময়ে বসন্তসেনার দিকে চেয়ে বললে, 'বসন্তসেনা বেঁচে আছেন।'

আর একজন ঘাতক বললে, 'আর তো আমরা চারুদত্তকে বধ করতে পারিনে। রাজাকে এখন খবরটা দেওয়া দরকার—চল।'

গোটা ব্যাপারটা হঠাৎ যেন উলটে গেল। সমস্ত ঘটনা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। তারা ক্রমশ ক্ষেপে উঠতে লাগল সংস্থানকের ওপরে। ব্যাপার আর সুবিধের নয় দেখে সংস্থানক গা-ঢাকা দিলে।

এই সময়ে বেজে উঠল তূরী-ভেরী—রাজপথের ভিড় ঠেলে পত্ পত্ করে নিশান উড়িয়ে চারুদত্তের সামনে এসে দাঁড়াল এক রাজদূত। চারুদত্তকে অভিবাদন করে বললে, 'স্বেচ্ছাচারী রাজা পালক নিহত এবং উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসেছেন রাজা আর্যক। তাঁর আদেশে নিরপরাধ চারুদত্ত মুক্ত।'

চারুদত্ত বলে উঠলেন, 'সেই আর্যক—যাঁকে রাজা পালক অকারণে বন্দী করে রেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ রাজা পালক যজ্ঞস্থলের পথে নিহত হয়েছেন।' রাজদূত সবিনয়ে বললে; 'রাজা আর্যকের দ্বিতীয় ঘোষণা হল—প্রীতি-বন্ধনের উপহারস্বরূপ রাজা আপনাকে কুশাবতী রাজ্য দান করেছেন।'

এমন সময় রাজপথের দিকে ভয়ানক একটা কোলাহল উঠল। উজ্জয়িনীর জনসমুদ্র যেন 'মার মার' করে ছুটে আসছে—কাকে যেন তাড়া করছে কুকুরের মত।

সে আর কেউ নয়—রাজা পালকের শ্যালক সংস্থানক। তার কীর্তি আর কারুর কাছে অজানা নেই। সংস্থানক প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে চারুদত্তের পা জড়িয়ে ধরলে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমাকে ওরা মেরে ফেললে।'

সদাশয় চারুদত্ত তাকে হাতে ধরে তুললেন। মৃদুমধুর কণ্ঠে বললেন, 'ওঠ, শরণাগতকে আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।'

চারুদত্তের কৃপায় সংস্থানক সে যাত্রায় কোন রকমে বেঁচে গেল। চারুদত্ত তাঁর উপকারী বন্ধুদেরও নানা পদে অভিষিক্ত করলেন। সংস্থানকের সেই বন্দী ভৃত্য—সে চিরদাসত্ব থেকে মুক্ত হল। যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উজ্জয়িনীর গৌরব বসন্তসেনাকে বাঁচিয়েছিলেন—তাঁকে রাজ্যের সমস্ত মঠের কুলপতি করে দেওয়া হল। সকলের প্রীতি ও বন্ধুত্বের মাঝখানে চারুদত্ত সসম্মানে কুশাবতী রাজ্যে রাজত্ব করতে লাগলেন।

....

দুঃখের তপস্যা

কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' থেকে

প্রাচীন ভারতের দুটি সমৃদ্ধ জনপদ—বিদিশা আর বিদর্ভ। বিদিশা বড়, বিদর্ভ ছোট। বিদিশার নামডাক বেশী। রাজাও তার মস্ত রাজা—অগ্নিমিত্র। যেমন বীর যোদ্ধা—তেমনি কলা-বসিক। একদিকে তাঁর রণনিপুণ সেনাপতিরা– অন্যদিকে দেশ উজাড় কবে যত শিল্পাচার্য আর নাট্যাচার্য এসে জড়ো হয়েছে অগ্নিমিত্রেব রাজ্যে। তাঁবা কেউ ছবির পর ছবি এঁকে ভরে তুলছেন রাজার চিত্রশালা, কেউ মহড়া দেন নাটক ও নৃত্যের, কোথাও বা ওঠে বীণার ঝঙ্কাবেব সঙ্গে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি। কখনও কখনও বেধে যায় আচার্যে আচার্যে ঘোর দ্বন্দ্ব—কে বড়। নস্যির গুঁড়ো-বারুদে ঘর অন্ধকাব, হাঁচির চোটে সেখানে টেকে কার সাধ্য! রাজা অগ্নিমিত্র সোৎসাহে জুগিয়ে যান সকলের মাসো-হারা—কখনও বা উপরি খুলে দেন খুশী হয়ে হাতের স্বর্ণ বলয় ও বাজু-বন্ধ। হেন রাজা অগ্নিমিত্র। এদিকে বিদর্ভ ছোট রাজ্য। তার রাজপুত্র মাধবসেনের ভারি সাধ হল—বিদিশার রাজার সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে মিতালি করা।

এই নতুন মিতালির খবর যাবে বিদিশায়—সব ঠিকঠাক। এমন সময় ঘটে গেল এক ওলট-পালট কাণ্ড। সেকালের রাজা-রাজড়ার তন্ত্র-মন্ত্র ষড়যন্ত্র—এই রাজা তো এই ফকির। পারিবারিক চক্রান্তে চলে গেল রাজপুত্র মাধবসেনের রাজ্যাধিকার, সপরিবারে তিনি বন্দী হলেন। বিদর্ভের রাজচ্ছত্র অধিকার করে বসল তাঁর জেঠতুত ভাইরা। হঠাৎ এই ওলট-পালটে মনে মনে ভাগ্যকে শুধু দোষ দিলেন বিদর্ভের রাজনন্দিনী মালবিকা।

বিদিশায় কোথায় যাবে ঘটকালির খবর—শেষে খবর গেল কি-না মাধবসেন সপরিবারে আটক, বিদর্ভের রাজনন্দিনী বন্দিনী! রাজা

অগ্নিমিত্র সব ঘটনা শুনলেন। শেষে তিনি নতুন বিদর্ভরাজকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন—'ছেড়ে দাও মাধবসেনের পরিবার পরিজনকে। বিদর্ভ-রাজনন্দিনী মালবিকা আমার বাগ্‌দত্তা।'

কিন্তু সে চিঠি যখন এসে পৌঁছল বিদর্ভে, তখন রাজকন্যা মালবিকা আর বিদর্ভে নেই। কোথায় যে চলে গেল—কেউ জানে না।

সারা দেশে পড়ে গেল 'খোঁজ খোঁজ!' কোটাল রক্ষী ছুটল পক্ষীর মত। রাজকন্যাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অগত্যা নতুন বিদর্ভরাজ অগ্নিমিত্রকে লিখে জানালেন—'বিদর্ভ-রাজনন্দিনী মালবিকা কোথায় চলে গেছে জানি না। তবে মাধবসেনের মুক্তি যদি চান তাহলে আমার শালা যে আপনার কারাগারে বন্দী আছে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

চিঠি পেয়ে অগ্নিমিত্র অগ্নিমূর্তি। গর্জন করে বললেন, 'ওই চক্রান্তকারী পাপিষ্ঠের সঙ্গে বন্দী বিনিময়! ওর চিঠির জবাবে সেনাপতি বীরসেনকে এক্ষুণি যুদ্ধসজ্জা করে এগিয়ে যেতে বল।'

বিদিশায় পড়ে গেল 'সাজ সাজ' রব। চলতে লাগল বিদর্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন।

বিদর্ভ রাজকুমারী মালবিকা তখন বিদর্ভ থেকে অনেক দূরে! মন্ত্রী সুমতি তার বাপের আমলের পাকা লোক, পাকা মাথা—ফন্দি ফিকিরে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠবে কে? একদিন তিনি ছদ্মবেশে নতুন বিদর্ভরাজের চোখে ধুলো দিয়ে মালবিকাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন বিদিশার দিকে, সঙ্গে গেল তাঁর এক ছোট বোন। মনের ইচ্ছে—রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে বিদর্ভের রাজনন্দিনীকে সমর্পণ করা।

বিদর্ভ ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন—মস্ত বড় এক সার্থবাহের দল, বাণিজ্য করতে চলেছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। চলেছে উটের সারি, গোযানের সারি। মন্ত্রী সুমতি নিজের বোন ও রাজকুমারীকে নিয়ে মিশে গেলেন এই বণিকদের সঙ্গে।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেখানেই কি সন্ধ্যে হয়! হঠাৎ একদিন বণিকদের ধনরত্নের লোভে 'রে-রে' ক'রে এসে পড়ল দুরন্ত দস্যুর দল।

লেগে গেল বণিকদেব সঙ্গে লড়াই। বণিকবা হটে গেল। ছত্রভঙ্গ তুরঙ্গম—পালাতে লাগল যে যেদিকে পারল। বুড়ো মন্ত্রী সুমতি শুধু একাই লড়তে লাগলেন প্রাণপণে—যেমন করে হোক বক্ষা করতে হবে প্রভুপুত্রী বিদর্ভের রাজনন্দিনীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। যুদ্ধ করতে করতে তিনি মারা গেলেন।

দস্যুরা বন্দিনী করে নিয়ে গেল রাজকুমারী মালবিকাকে।

দস্যুরা চলে গেলে পর বেরিয়ে এলেন আড়াল থেকে মন্ত্রী সুমতির বোন কৌশিকী। তিনি কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়ে গেছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি দাদার দেহের সৎকার করলেন। তারপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরে খুঁজে খুঁজে চললেন রাজকুমারী মালবিকাকে। কিন্তু কোথায় মালবিকা! মনে মনে আপসোস করে বলেন কৌশিকী—এতদিনে বোধ করি সেই সিদ্ধপুরুষের কথা ফলল। মালবিকার জন্মের

গল্পময় ভারত ॥ প্রথম খণ্ড

শ্বেতকেতুর শিক্ষা

সময় কোন এক সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন—রাজকুমারীকে একটি বছর দাসীর দুঃখ ভোগ করতে হবে, তারপর হবে এঁর সুযোগ্য পতিলাভ।

রাজকুমারী মালবিকা তখন চলেছে দস্যুদলের সঙ্গে কত গিরিকান্তার পার হয়ে। হাঁটতে পারে না—ছুটতে পারে না, কখনও চলার অভ্যেস নেই। তবু চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—এদেশ থেকে ওদেশ, এ-বন থেকে ও-বন। শেষে বিদিশার সীমান্তে। এমন সময় দস্যুর দল পড়ে গেল বিদিশার সীমান্তরক্ষী বীর সেনাপতি বীরসেনের সামনে। আর যাবে কোথায়! দুরন্ত দস্যুদলকে তিনি কচু-কাটা করে দিলেন। এ বিদর্ভ নয় যে ডাকাতেরা মনের সুখে লুঠপাট করে বেড়াবে! এ বিদিশা। রাজা অগ্নিমিত্রের প্রবল প্রতাপের ছায়ায় সর্বত্র বিরাজ করছে শান্তি।

দস্যুদের দলের মধ্যে বীরসেন দেখতে পেলেন—অপরূপ রূপবতী এক কন্যা। দস্যুর দল বিধ্বস্ত হওয়ায় আবার সে যেন অনাথা। হায়, কবে তার দুর্ভাগ্যের অবসান হবে! মালবিকা তার নিজের পরিচয় কিছুই দিলে না। বন্দিনীর দুর্ভাগ্য—লজ্জায় সব কথা বুঝি বা আটকে গেল।

সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর দিদির কাছে। দিদি তাঁর বিদিশার পাটরানী দেবী ধারিণী।

শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নের বিদিশায় এল মালবিকা কিন্তু বন্দিনী দাসী হয়ে। ভাইয়ের কাছ থেকে তাকে উপহার পেয়ে দেবী ধারিণী ভারি খুশী। মেয়ে তো নয়, যেন ফোঁটা একটি লাল কমল। খুশী হয়ে দেবী ধারিণী মালবিকাকে করে নিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখীদের একজন। আর মালবিকা ডাগর দুই চোখ মেলে দেখল—বহুদিনের শোনা এই সেই বিদিশা…এই সেই রাজপ্রাসাদ…এই সেই তার স্বপ্নের দেশ!…আর কোথায় সেই বহুখ্যাত বীর রাজা—যাঁর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল?

এদিকে মন্ত্রী সুমতির বোন কৌশিকীও ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হলেন বিদিশায়। মুখে তার পবিত্র দীপ্তি আর অঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর বেশ। তাঁকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন রাজা রানী দু-জনেই। তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজমহলেই। থাকতে

থাকতে নানা শলা, নানা পরামর্শে রাজারানীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলেন কৌশিকী।

রাজকুমারী মালবিকাকে একদিন দেখলেন তিনি—কিন্তু কিছু বললেন না। সেই সিদ্ধপুরুষের কথা মত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন—দাসীর দুর্ভাগ্য শেষ হয়ে কবে আসবে বিদর্ভ-রাজনন্দিনীর সৌভাগ্যের দিন।

সন্ন্যাসিনীর বেশে কৌশিকীকে মালবিকাও চিনতে পারল না।

এমনি করে রইল ওরা কাছে কাছে, কিন্তু তবু দূরে দূরে।

তারপর একদিন ভাগ্যের পথ খুলল বুঝি হতভাগিনী মালবিকা দাসীর। চিত্রশালায় ছবি দেখতে গিয়েছিলেন রাজা অগ্নিমিত্র আর রানী ধারিণী। হঠাৎ একটা ছবির কাছে থমকে দাঁড়ালেন রাজা। ছবিটা রানীর, পাশে দাসী মালবিকা। দেবী ধারিণী দেখলেন—রাজা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মালবিকার ছবির দিকে।

আর রাজা দেখলেন—রূপ তো নয়, ছবিও যেন আলো। রাজা শুধোলেন, 'এ কে!'

একজন বলে দিলে, 'নতুন দাসী, নাম মালবিকা।'

এর চেয়ে কি-ই বা আছে আর দাসী মালবিকার পরিচয়! তবু রাজার বুঝি মনে হল, সর্বসুলক্ষণা এ মেয়েটি তো সামান্য মেয়ে নয়। রাজার মনে আঁকা রইল সেই পটের ছবি।

সামান্য যে নয়—এ কথা স্বয়ং পাটরানীরও মনে হয়। দেখেন তিনি—দাসী মালবিকা নানা গুণে গুণবতী। শুরু হল এবার তার গুণের পরীক্ষা। দেবী ধারিণী একদিন বললেন, 'যাও মালবিকা, নাট্যাচার্য গণদাসের কাছে আজ থেকে তুমি অভিনয় ও নাচ শেখোগে।'

মালবিকা মন দিয়ে নাচগান অভিনয় শিখতে লাগল। আচার্য গণদাস এমন একটি গুণবতী ছাত্রী পেয়ে ভারি খুশী। যোগ্য ছাত্রছাত্রী পেলে শিক্ষকদের বড় আনন্দ। আচার্য সব বিদ্যে উজাড় করে শেখালেন।

এদিকে রাজার মনে কৌতূহল—কে সেই ছবি-আলো-করা মেয়েটি? স্বচক্ষে তাকে একবার দেখতে হবে। রাজার বন্ধু গৌতম; তাকে তিনি মনের কথা খুলে বললেন।

গৌতম বললেন, 'দেখবেন—সে এমন আর শক্ত কী ! আমি ব্যবস্থা করছি।'

রাজা বললেন, 'কি ব্যবস্থা করবে ?'

গৌতম বললেন, 'আপনার দু'জন নাট্যাচার্যের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছি। আপনি দু'দিন সবুর করুন।'

গৌতমের কূটবুদ্ধি। লাগিয়ে-ভাঙিয়ে আচার্য গণদাস আর আচার্য হরদত্তের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন—কে বড়। দুই পণ্ডিত আচার্য একদিন হাত-পা নেড়ে ঝগড়া করতে করতে রাজার কাছে এসে হাজির।

গণদাস বললেন, 'এই হরদত্ত ভালো ভালো সব লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছে—আমি নাকি ওর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই।'

সঙ্গে সঙ্গে হরদত্ত বললেন, 'মহারাজ, ও চারিদিকে বলে বেড়িয়েছে —আমি নাকি ডোবা আর ও একেবারে সমুদ্র। মহারাজ, আপনি আমাদের বিদ্যের পরীক্ষা করুন।'

সন্ন্যাসিনী কৌশিকী বিচার করে বললেন, 'কে কেমন শিক্ষা দিয়েছে তা দেখেই জানা যাবে—কে বড় আচার্য। এখন যে যাঁর ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এসে পরীক্ষা দিন।'

দুই আচার্য ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, 'উত্তম।'

গৌতমের কূটবুদ্ধির ফল ফলল। প্রথমেই আচার্য গণদাসের ছাত্রী মালবিকা এল পরীক্ষা দিতে।

রাজা দেখলেন মালবিকাকে—চোখে যেন আর পলক পড়ে না। মালবিকা তো নয়—এ যেন শরৎকালের মূর্তিমতী জ্যোছনা ! এর কাছে সেই আলো-করা পটের ছবিও যেন অন্ধকার কুচ্ছিৎ।

আর হতভাগিনী দাসী মালবিকা দেখল রাজাকে। ভয় হল তার—আজ যেন আচার্যের পরীক্ষা নয়, এ পরীক্ষা তার জীবন-মরণের, এ পরীক্ষা তার ভাগ্যের। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সে নাচল, গাইল—অপরূপ তার লাস্য।

জয়-জয়কার পড়ে গেল, শুধু আচার্যের নয়—মালবিকারও। রাজা মনে মনে বুঝতে পারলেন—এ কোনও বড় ঘরের মেয়ে না হয়ে যায় না।

রাজা মুগ্ধ—স্বয়ং পাটরানীও মুগ্ধ। আর সন্ন্যাসিনী কৌশিকী তখনও নীরবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলেন—কবে কাটবে হতভাগিনী মালবিকার দাসীর জীবন।

সে জীবন বোধ করি বা শেষ হয়ে এল মালবিকার। সামনে এল আর এক চরম পরীক্ষা। রানী ধারিণী হুকুম করলেন, 'যাও মালবিকা, একটা অশোক গাছে কিছুতেই ফুল ফুটছে না- -তুমি দোহদ দিয়ে এস।'

সেকালের গাছপালাও ছিল যেন মানুষের সামিল—তারও সাধ আছে, আহ্লাদ আছে। মানুষের পরশ না পেলে তাদেরও ফুল ফোটে না, হাসি ঝরে না। যারা সুলক্ষণা ভাগ্যবতী মেয়ে—তারা এমনি এসে বসত অশোক তরুর তলায়, ডগডগে করে পা ভরে পরত আলতা। তারপর সেই আলতা-পরা পায়ের ছাপ এঁকে দিত অশোক তরুর গায়ে। মেয়ে যদি ভাগ্যবতী সুলক্ষণা হয়, তা হলে ফুটে উঠত রাঙা অশোকের গুচ্ছ। আর যদি পোড়া-কপালী রাক্ষসী হয়—তা হলে অশোক গাছ যে-কে-সেই।

পাটরানীর আদেশ শুনে মালবিকার বুক দুরু দুরু। রাজনন্দিনী হলে হবে কী—এমনিতে তো তার পোড়া কপাল! এমন ভাগ্য কি তার হবে—ফুটবে ওই অশোক গাছে ফুল?

ধারিণী বললেন, 'ফুল যদি ফোটে, তা হলে মনের ইচ্ছে তোমার পূরণ করব।'

হায় রে তার মনের ইচ্ছে! ফুল-না-ফোটা সেই অশোক তরুর তলায় এসে মালবিকা কাঁদতে বসল। কত কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ভাইয়ের কথা, মনে পড়ল ঘটকালির কথা। কোথায় গেল সে দিন—আর আজ কিনা সেই বিদিশার রাজবাড়িতে সে পাটরানীর হতভাগিনী সহচরী মাত্র!

রানীর পরিচারিকাদের মধ্যে একজন ছিল মালবিকার খুব বন্ধু। নাম তার বকুলাবলিকা। সে এসে মালবিকাকে শান্ত করে আলতা পরিয়ে দিলে পায়ে—বেঁধে দিলে সুবর্ণের নূপুর। অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'রানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।'

মালবিকা বললে, 'এমন ভাগ্য কি আমার হবে!'

সেদিন বাগানে বেড়াতে এসেছিলেন রাজা অগ্নিমিত্রের আর এক রানী—নাম তাঁর ইরাবতী। সে রানী বড় অভিমানিনী—জটিলা-কুটিলা-লাগানি-ভাঙানি। রানী ইরাবতী দেখলেন মালবিকার অশোক তরুর দোহদ। দেখে রাগে মুখ থম্ থম্—পা ঝম্ ঝম্। চললেন পাটরানীর কাছে। পাটরানীও যে মালবিকাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দেন, তাকে নাচ-গান শেখান, আজ আবার অশোক তরুর দোহদ! সাধারণত দোহদে রানীরাই যায়—কিন্তু পাটরানী কিনা সেখানে পাঠিয়েছেন পরিচারিকা মালবিকাকে! এসব ব্যাপারে ইরাবতী মনে মনে জ্বলছিলেন! লাগিয়ে-ভাঙিয়ে পাটরানীর কাছে গিয়ে বললেন, 'মালবিকা দাসীর আস্পদ্ধা, সে আমাকে অপমান করেছে। তোমার আশ্কারাতেই ও এত বাড় বেড়েছে। ওর সঙ্গে আছে ওই নষ্টের গোড়া বকুলাবলিকা চেড়ি।'

রাজার যেমন বাইরের বিচার—অন্দরমহলে তেমনি হলেন পাটরানী। রানী ইরাবতীকে শান্ত করবার জন্য ধারিণী দেবী দণ্ডের আদেশ দিলেন—'মালবিকা আর তার সখী বকুলাবলিকাকে আটক রাখ পাতাল-ঘরে। পায়ে দাও লোহার বেড়ি।'

মালবিকার দুর্ভাগ্যের শেষ নাই। বন্দিনী হয়ে রইল সেই পাতাল-ঘরে—যেখানে ঢোকে না আলোর কিরণ, মানুষের রা। ওদিকে যেন তার ভাগ্যকে উপহাস করে ফুল ফুটল সেই এতদিনের ফুল-না ফোটা অশোক তরুতে। রাজা শুনলেন, পাটরানী শুনলেন—বুঝলেন, এ বড় ভাগ্যবতী সুলক্ষণা মেয়ে। আর শুনে শুনে শতগুণ জ্বললেন রানী ইরাবতী।

রানী ধারিণীর মনে কি আছে, কে জানে! কেউ তার খবর জানে না। প্রতিহারীর মুখে তিনি রাজার কাছে খবর পাঠালেন, 'মালবিকার দোহদে যে অশোক গাছে ফুল ফুটেছে, রাজার সঙ্গে তিনি বাগানে সেই ফুল ফোটা দেখতে যাবেন।'

আর সন্ন্যাসিনী কৌশিকী দেবীকে ডেকে বললেন, 'শুনেছি—আপনি নাকি ভালো সাজাতে পারেন। মালবিকাকে আজ আপনি সাজিয়ে দিন। তার অশোক গাছে ফুল ফুটেছে—আজ আমরা সবাই দেখতে যাব।'

মালবিকাকে মনের সাধে ভালো করে সাজিয়ে দিলেন কৌশিকী দেবী। মনে ভাবলেন—কে জানে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে আজ ওর মুক্তি কি না! সিদ্ধপুরুষের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর এক বছর তো হতে চলল।

ওদিকে বেদী বাঁধা হয়েছে অশোক তলায়—হয়েছে উৎসবের আয়োজন। রাজা এলেন, রানী ধারিণী এলেন, এল যত সহচরী। এল মালবিকা। দেবী কৌশিকী তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন বিয়ের কনেটির মত, অঙ্গে লাল চেলি—কপালে চন্দনের ফোঁটা।

সবাই ভাবে—কি আছে রানী ধারিণীর মনে, কে জানে!

এমন সময় এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'মহাবীর বীরসেন ষড়যন্ত্রকারী বিদর্ভরাজকে পরাজিত করে সপরিবারে কুমার মাধবসেনকে মুক্ত করেছেন। মাধবসেন এখন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নানা উপহার দিয়ে দূত পাঠিয়েছেন—দূতের সঙ্গে পাঠিয়েছেন দু'জন শিল্পী-কন্যা। নাচগানে তারা খুব নিপুণ।'

রাজা বললেন, 'নিয়ে এসো এইখানে।'

শিল্পী-কন্যা দু'জন এল অশোক তরুর উৎসবে। এসেই তাদের চক্ষু স্থির! মালবিকাকে দেখে চিনতে পারলে। সবিস্ময়ে বলে উঠল, আমাদের রাজকুমারী!'

রানী অবাক, রাজা অবাক।

রাজা বললেন, 'ইনি কে বললে? কোথাকার রাজকুমারী?'

একজন শিল্পী-কন্যা বললে, 'আমাদের বিদর্ভ-রাজনন্দিনী। যে মাধবসেনকে মহারাজের সেনাপতি বীরসেন মুক্ত করেছেন—সেই মাধবসেনের বোন মালবিকা।'

দেবী ধারিণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'রাজকুমারী মালবিকা! ছিঃ ছিঃ তবে তো আমি এতদিন চন্দনকে জুতোর মত ব্যবহার করেছি!'

রাজা শুধোলেন, 'কেমন করে এমন হল?'

শিল্পী-কন্যা বললে, 'আমাদের মন্ত্রী সুমতি একদিন তাঁর বোন ও রাজকন্যাকে নিয়ে ছদ্মবেশে কোথায় পালালেন—আমরা কেউ জানি না। তারপর রাজকুমারীর আর কোনও খবর জানতুম না।'

এতক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্ন্যাসিনী কৌশিকী। তিনি বলে উঠলেন, 'তার পরের ঘটনা আমি জানি। শুনুন তবে।'

তাঁর গলা শুনে রাজা রানী চমকে উঠে তাকালেন তাঁর দিকে, চমকে উঠল শিল্পী-কন্যা দু'জন। তারা বলে উঠল, 'এ কী, কৌশিকী ঠাকরুণের গলা শুনতে পাচ্ছি যেন!'

কৌশিকী ঠাকরুণ এগিয়ে এলেন—শিল্পী-কন্যা দু'জন গড় হয়ে প্রণাম করলো, প্রণাম করলেন রাজা অগ্নিমিত্র, রানী ধারিণী।

রাজা শুধোলেন, 'এঁরা কি সকলেই কৌশিকী দেবীর চেনা লোক?'

কৌশিকী দেবী বললেন, 'আমি বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী সুমতির বোন।'

'আপনি!' রাজা ও রানী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

কৌশিকী দেবী বলতে লাগলেন অতীত ঘটনার কথা—কেমন করে তাঁরা বিদিশায় আসবার জন্য রাজকন্যাকে নিয়ে বণিকদের দলে ঢুকলেন, কেমন করে দস্যুরা আক্রমণ করলে—তাঁর দাদা লড়াই করতে করতে নিহত হলেন, বিদর্ভ-রাজনন্দিনী কেমন করে ভেসে চললেন তাঁর ভাগ্যের স্রোতে খড়কুটোর মত।

রাজা শুধোলেন, 'এতদিন আপনি এসব কথা বলেননি কেন?'

কৌশিকী দেবী বললেন, 'আমি এক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বলেছিলেন—রাজকুমারীর এক বছর দাসীর দুঃখ ভোগ আছে।'

এমন সময় আর এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'সেনাপতি পুষ্প-মিত্র জানিয়েছেন—দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যে ঘোড়াটি ছাড়া হয়েছিল—তা মহারাজের প্রবল প্রতাপ দশদিকে ঘোষণা করে ফিরে এসেছে।'

এ যশোগৌরবে রাজা খুশী, রানী খুশী। এমন দিনে রাজা রানী পারিতোষিক দেন। রানী প্রতিহারীকে বললেন, 'যাও, অন্তঃপুর-বাসিনীদের কাছে এই খবর দিয়ে এস। আর রানী ইরাবতীকে বল—মালবিকার জন্ম রাজকুলে। অশোক ফুল ফোটাবার ভার দেওয়ার সময় তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—তার মনের ইচ্ছে আমি পূরণ করব। আজ সেই দিন। আজ তাকে মুক্ত করলাম। তিনি যেন না রাগ করেন।'

খবর শুনে রানী ইরাবতী আর কি বলবেন! পাটরানীর ওপরে কথা বলেন—এত সাহস তাঁর নেই। তাঁর মতেই মত দিলেন।

নানা মঙ্গল সংবাদে রাজপ্রাসাদ আনন্দ লহরীতে ভরা—তেমনি সারা বিদিশায় কলকাকলী। বিশেষ করে দিগ্বিজয়ের সংবাদে।

সেই আনন্দে দেবী ধারিণী মালবিকার হাত ধরে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বোনের মত! এস বোন—তোমার গুরুজনদের যে ইচ্ছে ছিল—তোমাকে রাজার হাতে সমর্পণ করা—তাই আমি আজ পূরণ করি।'

কৌশিকী দেবী মালবিকার সামনে এসে বললেন, 'জয় হোক ঠাকুরাণী। আমার মনের সাধ এতদিনে মিটল।'

প্রাসাদ জুড়ে বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। এত দিনে হল বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনীর দুর্ভাগ্যমোচন।

....

ভোরের স্বপ্ন

সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা' থেকে

এক ছিলেন রাজা—তাঁর নাম চিন্তামণি। রাজার একটি ছেলে—নাম তার কন্দর্পকেতু। মুনিজনের আদরের ধন—গেরস্তের পরম নির্ভর। তার রূপের দিকে চেয়ে কেউ চোখ ফেরাতে পারে না—গুণে মানুষের কথা কুলোয় না, বীরত্বে চারিদিক সন্ত্রস্ত। রাজ্যে কারুর হাত কাটা যায় না—কারণ চোর বদমাস নেই। আগুনে পুড়ে কেউ মরে না—পোড়ে শুধু গয়না তৈরীর সোনা। শত্রু নেই যে যুদ্ধ হবে।

কুমার কন্দর্পকেতু একদিন এক স্বপ্ন দেখলে—ভোর তখন হয়-হয়। এমন ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। কন্দর্পকেতু দেখলে—অপরূপ সুন্দরী এক রাজকুমারীকে। কোন্ দেশে হায় নিবাস যে তার—কে জানে! চোখ তো নয়—ভোরের শিশির-ধোয়া পদ্মের পাপড়ি, চাঁদের কণা ছেনে মুখের লাবণি, কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। তারপর কোথায় কী, আকাশের নীলিমায় স্বর্গের সে ছবি যেন স্বর্গে মিলিয়ে গেল। কন্দর্পকেতুর ঘুম ভেঙে গেল। তেমনি মন ভেঙে গেল দুঃখে—কোথায় গেল সে পটে-আঁকা ছবি! পড়ে রইল রাজকাজ, দূরে রইল মৃগয়াবিহার—ঘুচে গেল আহারনিদ্রা। দিন গেল—রাত্রি এল, কিন্তু সে স্বপ্ন তো আর চোখে নামে না!

কুমারের বন্ধু মকরন্দ বোঝাতে এল। বললে, 'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয়। কাজকর্মে মন দাও—রাজ্যপাট দেখ।'

কন্দর্পকেতু বললে, 'যেখান থেকে হোক, স্বর্গের সে ছবি আমি খুঁজে বের করব। আমি চলে যাচ্ছি দেশান্তরে। সঙ্গে যদি যেতে চাও তো চল।'

মকরন্দ আর কি করে, সঙ্গ নিল কন্দর্পকেতুর। যত হোক—রাজকুমার তার ধুলোখেলার বন্ধু, ছেলেবেলার সাথী। দু'জনে বেরিয়ে

গেল রাজ্য ছেড়ে অনিশ্চিতের সন্ধানে। এ খবর রাজ্যের আর কেউ জানল না।

বহুদূর এসে থামল ওরা সেই বিন্ধ্যাচলে—চুড়ো যার নুয়ে আছে ঋষি অগস্ত্যের জন্য। সানুদেশে ঘোর অরণ্য—হিংস্র শ্বাপদে ভরা, আকাশের আলো গিয়ে ছুঁতে পারে না বনের মাটি। গাছে-পালায় লতায়-পাতায় অন্ধকার! তাকে বেড় দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী রেবা ; দুই তীরে তার কলহংসের কাকলী, ঠাণ্ডা ছায়ায় দোয়েল কোয়েলের কূজন। সেইখানে এসে ওরা সেদিনের মত থামল। সূর্য তখন পাটে নেমেছে।

বনের ফলপাকুড় পেড়ে এনে মকরন্দ কন্দর্পকেতুকে খেতে দিলে—নিজেও খেলে কিছু। তারপর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় গাছ দেখে দুটো ডাল আশ্রয় করলে দু'জনে। দেখতে দেখতে ঘোর জঙ্গলের রাত শাঁ-শাঁ করতে লাগল চারদিকে।

পাশের গোলাপ-জামের গাছে থাকে হরেক রকমের পাখি। সূর্যের পাট গুটোবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে এল গাছে। রাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলের কল-কাকলী থেমে এল। হুতোম প্যাঁচা বেরুল রাতের পাহারায়। চারদিক নিঃসাড়। এর মধ্যে ময়না-বৌ শুধু ঘর-বার করতে লাগল—ময়না তখনও ফেরেনি। ভয়ে ভাবনায় আর এক গাছে বুঝি উড়ে বসেছিল—পাহারাদার হুতোম হেঁকে দিলে—ভূত্ ভূতুম্। বেচারী ময়না-বৌ আবার নিজের গাছের ডালে ঘরের আঙিনায় এসে বসে রইল হা-পিত্যেশ করে। ময়না কোথায় গেল—কে জানে!

ময়না ফিরে এল অনেক রাত করে। ময়না-বৌ খ্যার খ্যার করে উঠল।

ময়না বললে, 'থামো থামো। সে ভারি এক মজার গল্প—শুনতে শুনতে আটকা পড়ে গেছলাম। এমন কাণ্ড আর কেউ কখনও শোনেনি।'

ময়না-বৌ বললে, 'ওমা, সে আবার কী!'

এই সময়ে কন্দর্পকেতু মকরন্দের কানে কানে বললে, 'কথা বল না যেন বন্ধু—ময়নার গল্প শোন।'

ময়না গল্প বলতে লাগল ময়না-বৌকে।

সে এক অপরূপ রাজ্য। রাজ্যের নাম কুসুমপুর। শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কত খোদিত মূর্তির সারি, কত গড়-গোষ্ঠ কুসুমকুঞ্জ। এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, তীর ঘেঁষে ভুর্ ভুর্ করছে চন্দনের বন। তার রাজার নাম শৃঙ্গারশেখর। রাজ্যে তাঁর সুখশান্তির অবধি নেই। যেমন ন্যায়ধর্ম—তেমনি দেওয়া থোওয়া। পদ্মের কলির মুখ বন্ধ হয়—কিন্তু রাজার ধনভাণ্ডারের মুখ কখনও বন্ধ হয় না।

রাজার একটিমাত্র মেয়ে—নাম তার বাসবদত্তা। তিন লোকের যত রূপ আর গুণ যেন তার পায়ের তলায় লুটোপুটি। রাজকুমারীকে প্রার্থনা করে কত দেশ-দেশান্তর থেকে ঘটক ভাট আসে—কিন্তু বাসবদত্তা সে সবে উদাসীন। রাজার মনে তাই দুঃখ। কোথায় কোন্ দেশ থেকে আসবে কোন্ রাজার কুমার—কে জানে! সাত পাঁচ ভেবে রাজা শৃঙ্গারশেখর একদিন করলেন স্বয়ংবর সভার আয়োজন। দূতের মুখে খবর পাঠিয়ে দিলেন চারদিকে।

দেশ-দেশান্তর থেকে সব রাজা-রাজরা এসে জড়ো হতে লাগল কুসুমপুরে। রাজ পথ মুখরিত হল হাতীর গলার ঘণ্টা আর কাম্বোজী ঘোড়ার খুরের শব্দে। যুদ্ধ নয়—তবু যেন এ এক যুদ্ধক্ষেত্র। কোনও রাজার ইয়া গালপাট্টা দাড়ি, কারুর বা প্যাচ দেওয়া গোঁফ—বালা বাজু মুকুটের মণিমুক্তায় কুসুমপুরের রাত যেন জ্বলজ্বলে দিন। স্বয়ংবরের দিন রাজারা সব যে যার ভালো ভালো বসন-ভূষণ পরে রাজা শৃঙ্গারশেখরের সভা আলো করে বসল। কারুর হস্তী সম্পদ, কারুর বা অশ্ব সম্পদ, কারুর বা মণিমুক্তার অবধি নেই। অশ্বের গরবে কেউ বসল ঘাড় বেঁকিয়ে —যেন তেজী আরবী ঘোড়া। হাতীর দেমাকে কেউ বসল শুঁড় পাকিয়ে —কেউ বা মণিমানিকে ছেয়ে কটমট করে তাকাতে লাগল এ-ওর দিকে। দরকার পড়লেই যেন লাগিয়ে দেবে মল্লযুদ্ধ।

ওদিকে বেদীর ওপর এসে সেজে দাঁড়াল বাসবদত্তা। পাশে এক সখী—হাতে তার চুয়া চন্দনের কাঞ্চন-থালা। তারপর শুরু হল এক-এক রাজার পরিচয়। পরিচয় তো নয়, হাতী, ঘোড়া, মণিমানিক, বিষয়-

সম্পদের লম্বা লম্বা ফর্দ। ধনদৌলতের কথা শুনে রাজকুমারীর চোখ জ্বলে না—মন গলে না। সব রাজার পরিচয় দেওয়াও শেষ হল আর—বাসবদত্তাও ফিরে চলে গেল বরণের থালা নিয়ে।

রাজারা সব ফুঁসতে ফুঁসতে সভা ভঙ্গ করে চলে গেল।

সেইদিন রাতে রাজকন্যা দেখলে এক স্বপ্ন—সামনে যেন এসে দাঁড়াল, অচিন দেশের এক রাজকুমার। সে কোন্ স্বপ্নের দেশের রাজকুমার, কে জানে! স্বয়ংবর সভায় তাকে দেখা যায় নি। রাজকন্যার কানে কানে কে যেন বলে দিলে—ও হল রাজা চিন্তামণির ছেলে কুমার কন্দর্পকেতু। তিন লোকের রূপ-গুণ ছেনে তৈরী সেই মূর্তি—রাজকুমারী বাসবদত্তা যেন তারই গলায় দিলে স্বয়ংবর সভার বরণমালা। তারপর আস্তে আস্তে সে মূর্তি মিলিয়ে গেল কোথায়!

বাসবদত্তা ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল। তবু যে দিকেই তাকায়—দেখে সেই কুমার কন্দর্পকেতুকে, সে মূর্তি যেন আকাশে আঁকা, আলোয় আঁকা—অন্ধকারে আঁকা। বাসবদত্তা তার স্বপ্নের সব কথা বললে সাধের শারী তমালিকাকে।

কিন্তু কোন্ দেশে থাকে সেই রাজকুমার! এত বড় স্বয়ংবর সভা—দেশ-দেশান্তর থেকে এল দলে দলে কত রাজা, এল না শুধু সেই কন্দর্পকেতু। অথচ তারই গলায় রাজকুমারী দিয়ে বসল বরণের মালা! এখন কোথায় পাওয়া যাবে তাকে! তমালিকা ভাবতে বসল।

এদিকে রাজা শৃঙ্গারশেখর স্বয়ংবর সভা ভেঙে যাওয়ার পর কন্যা-দায়ের চিন্তায় অস্থির! কন্যাদায় বিষম দায়—রাজার ঘরেও নিস্তার নেই। তিনি বললেন, 'এখন কি উপায়!'

'কি উপায়' বলে তাড়াতাড়ি তিনি কন্যা-দায়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিদ্যাধরদের রাজকুমার পুষ্পকেতুর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক করে ফেললেন। ঠিক হয়ে গেল শুভদিন শুভলগ্ন।

সে দিন যত ঘনিয়ে আসে—ভেবে মরে বাসবদত্তা, ভেবে মরে সখীরা। স্বপ্নের রাজকুমারকে দেওয়া বরণমালা স্বপ্ন হয়েই বা থেকে গেল বুঝি!

এমন সময় ময়নাই কুমার কন্দর্পকেতুর সন্ধান দেবে বলে এই বিন্ধ্যাচলে টেনে এনেছে বাসবদত্তার পোষা সাধের শারী তমালিকাকে।

ময়না-বৌ শুধোলে, 'কিন্তু কোথায় তোমার কুমার কন্দর্পকেতু?'

ময়না বললে, 'ওই তো পাশের গাছে বসে আছে তার বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে। আর শারী তমালিকা বসে আছে তলার এক ডালে।'

ময়না আর ময়না-বৌয়ের কথা শুনে কুমার কন্দর্পকেতু অবাক। অবাক তার বন্ধু মকরন্দ। গাছ থেকে নেমে এসে সত্যি সত্যি দেখতে পেলে শারী তমালিকাকে।

কন্দর্পকেতু শুধোলে, 'কে সেই রাজার কন্যা? কেমন তাকে দেখতে?'

তমালিকা নিবেদন করে বললে, 'আমার রাজকন্যার বরণমালা দেওয়া সত্যি হোক কুমার, রাজকুমারী যেন সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়। আপনি চলুন তাড়াতাড়ি। ওদিকে বিদ্যাধরকুমার পুষ্পকেতু হয়তো এসে পড়বে। আমরা তাড়াতাড়ি না গেলে রাজকুমারী হয়তো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সত্য রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে।'

নানা কৌতূহলে কন্দর্পকেতু আর মকরন্দ চলল তমালিকার সঙ্গে সঙ্গে। সারাপথ ভাবতে ভাবতে চলল—কে এই রাজকুমারী! এ কী তার সেই স্বপ্নে-দেখা কন্যা—কে জানে! চলতে চলতে রাত শেষ হল—দেখতে দেখতে দিনও শেষ হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে এল। শারী তমালিকা পথ দেখিয়ে উড়ে চলেছে তো চলেছেই। দিনের ধুলো মাখা ছেড়ে চড়ুইয়ের দল ফিরে এল গাছে, কাকেরা উড়ে গেল বাসায়, ঠাকু'মায়েদের গলায় গুন্‌গুন্ করে উঠল ঘুমপাড়ানী ছড়া, তপোবন মুখরিত হয়ে উঠল সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। তারপর ধীরে ধীরে লক্ষ তারার মেলায় আকাশে বসল পূর্ণ চাঁদের সভা।

এমন নিঝ্‌ঝুম রাতে কন্দর্পকেতু ও মকরন্দ এসে পৌঁছল কুসুমপুরের রাজপুরীতে। তমালিকা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কোথা দিয়ে ঘুরে ফিরে তারা চলেছে তমালিকার পেছনে পেছনে সে যেন এক গভীর রহস্য। থম্ থম্ করছে নিশুতি রাজপুরী।

কত গলি-ঘুঁজি পার হয়ে, কত তোরণ স্তম্ভের সারি পার হয়ে, কত সুড়ঙ্গের নীচে নেমে—উপরে উঠে, শেষে একেবারে থমকে এসে দাঁড়াল তারা রাজকুমারী বাসবদত্তার সামনে। কন্দর্পকেতু অবাক চোখে দেখলে—এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যা! আর বাসবদত্তা দেখলে—এই সেই রাজার কুমার কন্দর্পকেতু।

এমন সময় বাসবদত্তার এক সখী কলাবতী ছুটে এসে বললে, 'রক্ষা কর রাজকুমার! ভোর হয়ে এল—আর দেরী নেই। বিদ্যাধরকুমার পুষ্পকেতু তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই রাজপুরীতেই আছেন। সকাল হলেই রাজা বাসবদত্তাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন।'

কন্দর্পকেতু বললে, 'ভয় নেই।'

তারপর রাজার ঘোড়া-শাল থেকে কন্দর্পকেতু বেছে নিয়ে এল এক পক্ষীরাজ। বাসবদত্তাকে তার ওপর তুলে দিয়ে কন্দর্পকেতু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে আবার সেই দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যের দিকে। নিমেষে যোজন পার! দেখতে দেখতে কত গিরি নদী কান্তার পার হয়ে এল তারা। ভোর তখন হয়-হয়।

ওদিকে কুসুমপুরের রাজপুরীতে শানাই ধরেছে তখন ভৈরবীর তান। আর কুমার পুষ্পকেতু মানিকের আয়নায় মুখ দেখছেন নানান ছাঁদে।

গভীর বিন্ধ্যারণ্যের এক লতাকুঞ্জে এসে আশ্রয় নিলে কন্দর্পকেতু। এসেই শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়ল ঘুমে। ঘুম তো নয়—যেন বিধির অভিশাপ। ভোর হল, সূর্য উঠল—সারা বিন্ধ্যারণ্য জেগে উঠল পাখিদের কল-কাকলীতে, কিন্তু কুমার কন্দর্পকেতুর ঘুম যেন আর ভাঙে না।

বাসবদত্তা গেল ফলপাকুড়ের সন্ধানে। কাল সারা রাত খাওয়া নেই রাজকুমারের—ঘুমের মধ্যেও মুখ তার শুকিয়ে করুণ। ফলপাকুড় খুঁজতে খুঁজতে একটু দূরেই চলে গেল বাসবদত্তা।

এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল—বনের মধ্যে কিরাতদের ছোট ছোট কুঁড়ে। ওরই মধ্যে কিরাত-রাজের ঘরটি ঝকমক করছে। একজন কিরাত-রক্ষী তাকে দেখতে পেয়ে ছুটল কিরাত-রাজকে খবর দিতে।

এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে এসে পড়ল আর এক দল নতুন কিরাত সেনা, পত্ পত্ করে উড়ছে তাদের নিশান। অশ্বের হ্রেষায় আর কাড়া-নাকাড়ার শব্দে গোটা বনভূমির যেন ঘুম ভেঙে গেল। ওদের চরও বাসবদত্তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল ওদের সেনাপতিকে খবর দিতে। বাসবদত্তা ভাবলে—হয়তো তাকে খোঁজবার জন্য তার বাবা সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন।

ওদিকে রক্ষীর কাছে খবর পেয়ে কিরাত-রাজ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটে এল বাসবদত্তাকে ধরবার জন্য। নতুন আগত কিরাত সৈন্য-সামন্তের মধ্যেও পড়ে গেল সাড়া—তারাও ছুটে এল বাসবদত্তাকে ধরবার জন্য। তারপর দেখতে দেখতে দুই দলে লেগে গেল ভীষণ্ লড়াই। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটতে লাগল শন্ শন্ করে। দু'পক্ষের তীরবৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে গেল বিন্ধ্যারণ্য। এখানে ওখানে জমতে লাগল সৈনিকদের মৃতদেহের স্তূপ। রক্তের নদী বয়ে গেল অঝোর ধারায়। আকাশ কালো করে উড়ে এল বিন্ধ্যারণ্যের ভয়াল শকুনের ঝাঁক, বনের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র শ্বাপদেরা। প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালাতে লাগল হরিণেরা। বাসবদত্তাও ভয়ে ছুটে পালাল।

অল্প দূরেই ছিল এক ঋষির আশ্রম। বাসবদত্তা সেই আশ্রমে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধের কোলাহলে ধ্যান ভেঙে ঋষিও বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কুটিরের বাইরে। এসেই দেখতে পেলেন বাসবদত্তাকে—ভয়ে সে তখত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ঋষি বুঝতে পারলেন—এই বাসবদত্তার জন্যই বেধে গেছে লড়াই।

রাগে ঋষি হয়ে উঠলেন অগ্নিশর্মা। অভিশাপ দিলেন, 'তোর জন্যই আমার আশ্রমের শান্তি নষ্ট হয়েছে। যা—আজ থেকে তুই ওইখানেই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

ঋষির অভিশাপে বাসবদত্তার পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে পাথর হয়ে আসতে লাগল। হায়, কোথায় রইল রাজরাজেশ্বর পিতা—কোথায় রইল কুমার কন্দর্পকেতু! বাসবদত্তা কেঁদে উঠল—'দয়া করো—দয়া করো ঋষি!'

ঋষির দিকে ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাসবদত্তা পাষাণ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল সেই ঋষির আশ্রম-প্রাঙ্গণে।

ওদিকে কুমার কন্দর্পকেতু তখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। বেলা অনেকখানি হয়েছে। কন্দর্পকেতু এদিক ওদিক চেয়ে ডাকল, 'বাসবদত্তা !'

কোথায় বাসবদত্তা—কোথায় কে ! লতাকুঞ্জ শূন্য। বাসবদত্তা কোনও সাড়া দিলে না।

অবাক হয়ে কন্দর্পকেতু আশেপাশে বাসবদত্তাকে খুঁজতে লাগল। দিন গেল—রাত এল, বাসবদত্তার দেখা নেই। তারপর দিনের পর দিন গেল—কাছে থেকে দূরে গেল, সারা বনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল কন্দর্পকেতু। রাজকুমারের পোশাক ছিঁড়ে হল ট্যানা, মুখ হল মলিন, মাথার চুলে ধরল জটা। কন্দর্পকেতু খুঁজছে তো খুঁজছেই। কখনও কখনও নাম ধরে ডাক পাড়ে—'বাসবদ-ত্তা-া।'...বিন্ধ্যাচলের গিরি-কন্দরে অরণ্যের গভীর ছায়ায় ছায়ায় সে ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে, 'বাসবদ-ত্তা-া।'...তরুলতা পশুপাখিকে ডেকে ডেকে শুধোয় কন্দর্পকেতু, 'তোমরা কি কেউ বাসবদত্তাকে দেখেছ?' তারা চেয়ে থাকে অবোধ চোখে।

পাগলের মত অরণ্য খুঁজে খুঁজে ফেরে কন্দর্পকেতু। সোজা দক্ষিণে যেতে যেতে একদিন শেষ হয়ে গেল বিন্ধ্যাটবীর অর্জুন-শাল-চন্দনের অরণ্য, বেতসের লতাকুঞ্জ। দেখতে পেলে সামনে গর্জন করছে উত্তাল সমুদ্র। কন্দর্পকেতু ছুটে গেল সেই দিকে—সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন করবে।

এমন সময় দৈববাণীর মত কে যেন বলে উঠল, 'কিছুদিন পরেই বাসবদত্তার তুমি দেখা পাবে।'

কন্দর্পকেতু থমকে দাঁড়াল। প্রাণ বিসর্জন করা আর হল না। কুমার কন্দর্পকেতু ফিরে চলল আবার সেই অরণ্যের দিকে। গাছের ফলপাকুড় খেয়ে কোন রকমে প্রাণ-ধারণ করে রইল।—কবে আবার বাসবদত্তার দেখা পাবে, কে জানে! শীত গেল—গ্রীষ্ম গেল, বিন্ধ্যাটবী জুড়ে নামল ভয়ঙ্কর বর্ষা, ঢল নামল বিন্ধ্যাচল থেকে—মহাবর্ষার রাঙা

জল। বিজবিজিয়ে উঠল পোকা-মাকড়, এদিক ওদিক লাফ দেয় সোনা ব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ। আর মাথার ওপরে অঝোর ধারায় বর্ষা—গুরু গুরু মেঘের গর্জন আর বজ্রপাত। তারই মধ্য দিয়ে খ্যাপা উদাসীনের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কন্দর্পকেতু।

তারপর একদিন বর্ষার মেঘ কেটে দেখা দিল শরৎকাল। ফুটে উঠল যুথী মালতীর মুকুল, পাহাড় থেকে নেমে এল আবার চিত্রল হরিণের পাল, জাফরানের পরাগে মেঘমুক্ত আকাশ যেন হয়ে উঠল হলুদ বরণ। কন্দর্পকেতু ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে দাঁড়াল সেই ঋষির আশ্রমের প্রাঙ্গণে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাসবদত্তার পাথরের মূর্তির দিকে।

কুমার সেই দিকে ছুটে গেল পাগলের মত, 'বাসবদত্তা !'

হায়, এ যে পাষাণ ! এ যে প্রাণহীন ! এ যে কঠিন পাথরের বাসবদত্তা !

কিন্তু দেখতে দেখতে কুমারের হাতের ছোঁয়ায় সেই পাথরের মূর্তিতে ফিরে এল প্রাণ। অভিশাপমুক্ত হয়ে বাসবদত্তা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তাকাল কুমার কন্দর্পকেতুর দিকে।

কুমার শুধোলে, 'কেমন করে হল তোমার এমন অবস্থা ?'

বাসবদত্তা বললে ঋষির অভিশাপের কাহিনী। তারপর বললে, 'দয়া করে ঋষি একদিন এই বরটুকু দিয়েছিলেন—কুমার এসে যেদিন তোমায় স্পর্শ করবে, সেই দিনই তুমি ফিরে পাবে প্রাণ।'

বহু দুঃখের শেষে বাসবদত্তাকে নিয়ে কুমার কন্দর্পকেতু আবার ফিরে চলল রাজ্যে।

....